ইমান্যুয়েল কাণ্ট

ইমানুয়েল কাণ্ট

হুমায়ুন কবির

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশি

Published by the University of Calcutta and Printed at Sree Saraswaty Press Ltd., 1, Ramanath Mazumder Street, Calcutta by S. N. Guha Ray, B.A.

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

উদার চরিতেষু

ভূমিকা

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রসিদ্ধ নেতা স্মাটসের সম্বন্ধে বলা হয় যে বুয়র যুদ্ধের সময়েও প্রতি রাত্রিতে তিনি কান্টিয় দর্শন অধ্যয়ন করিতেন। সে সম্বন্ধে একজন ইংরেজ দার্শনিক বলিয়াছিলেন যে এ রকম লোকের বিরুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতিরা যে বারে বারে পরাজিত হইবেন তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। ভাবিয়া দেখিলে কিন্তু স্মাটসের কার্য্যকলাপের মধ্যে গভীর যৌক্তিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষের দৃষ্টি সাক্ষাৎ বর্ত্তমান বা ক্ষণিকের প্রতি নির্দ্দিষ্ট। কিন্তু ক্ষণিককে ক্ষণিক বলিয়া জানিতে হইলেও তাহার নশ্বরতাকে অতিক্রম করিতে হইবে। কেবল তাহাই নহে, যুদ্ধক্ষেত্রের উন্মাদনায় বুদ্ধির শান্ত সমাহিত দৃষ্টি যেমন প্রয়োজনীয় তেমনি দুর্ল্লভ। ক্ষণিকের উত্তেজনায় স্থায়ী কল্যাণকে ভুলিবার সম্ভাবনা সেখানে বেশী,—অথচ যুদ্ধক্ষেত্রের বিভ্রান্তির মধ্যে মুক্তির একমাত্র উপায় বুদ্ধির স্থির বিচার।

বর্ত্তমানে বাঙলাদেশে বিভ্রান্তি এবং উত্তেজনার লক্ষণ এত তীব্র যে তাহাকে যুদ্ধক্ষেত্রের সঙ্গে তুলনা করা অসঙ্গত নহে। প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা, ব্যক্তি এবং দলগত বিদ্বেষ, দার্শনিক দিকভ্রান্তি এবং ঐতিহাসিক বিভ্রম, রাজনৈতিক

অস্থিরমতি এবং অর্থনৈতিক কুজ্ঝটিকায় চারিদিক এমন ধূমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে যে তাহাতে যে কেবল দৃষ্টির ব্যাঘাত ঘটিতেছে তাহা নহে, জীবন ধারণের পক্ষেও তাহা প্রতিকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতেছে। এ সঙ্কটের দিনে কান্টিয় দর্শনের নিরাবেগ ও সমাহিত বুদ্ধির সাধনা আমাদের জীবনে নূতন প্রেরণা আনিতে পারে, কারণ সে দর্শনের সিদ্ধান্তকে না মানিলেও তাহার বিচার-ভঙ্গি এবং মানসিকতা যদি আমরা গ্রহণ করি, তবে হয় তো আজিকার দিনে নূতন লক্ষ্যের সন্ধান মিলিবে।

এ আশা যে দুরাশা নয়, তাহা মনে করিবারও কারণ রহিয়াছে। বাঙলা দেশে আজ যে চিন্তা এবং আদর্শের নৈরাজ্য, বিশ্বব্যাপী বিভ্রান্তি এবং অনিশ্চয়তার প্রাদেশিক বিকাশ হিসাবেই তাহার অস্তিত্ব। বাঙলার সমস্যাগুলিই ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে বৃহত্তর আকারে ধরা দেয়, এবং ভারত-বর্ষের সমস্যা বিশ্বসমস্যারই অচ্ছেদ্য অঙ্গ। সভ্যতায় আজ ভাঙন ধরিয়াছে। সেই ভাঙনের ঢেউই বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন আকারে দেখা দিতেছে। সে ভাঙনের অর্থ যদি আমরা বুঝিতে চাহি, ভাঙনের মধ্যেও নূতন সৃষ্টির ইঙ্গিতের সন্ধান করি, তবে বর্ত্তমানের সভ্যতার আঙ্গিক এবং উপাদান দুইয়েরই সঙ্গে নিগূঢ় পরিচয় প্রয়োজন। সে পরিচয়ের জন্য কান্টিয় দর্শন একেবারে অপরিহার্য্য, কারণ কান্টের চিন্তাধারা বর্ত্তমান সভ্যতার আকৃতি এবং প্রকৃতিকে গভীরভাবে রঞ্জিত করিয়াছে। দর্শনের ক্ষেত্রে যে আজিও কান্টিয় যুগ চলিতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও কান্টিয় আপেক্ষিকতার প্রসার হিসাবেই অনেক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক

পদার্থবিদ্যার নূতন তত্ত্বগুলিকে বুঝিতে চাহিয়াছেন। রাজনীতি ও শিল্পশাস্ত্র, ইতিহাস এবং জীবতত্ত্ব—সমস্ত ক্ষেত্রেই কান্টিয় দর্শনের প্রগাঢ় প্রভাব প্রতিপদে ধরা দেয়। বর্ত্তমান সভ্যতাকে নূতন করিয়া গড়িতে চাহিলেও তাই কান্টিয় বিশ্বদৃষ্টি বোঝা আমাদের জন্য প্রয়োজন।

বাঙলায় কাণ্ট সম্বন্ধে কোনদিন বিস্তারিত আলোচনা হয় নাই। শুনিয়াছি যে বহুদিন পূর্ব্বে একবার স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর এ সম্বন্ধে আলোচনা সুরু করিয়াছিলেন, কিন্তু সে বহুদিনের কথা, এবং সে সম্বন্ধে খুব কম লোকই জানে। তাহা ছাড়া, সে যুগে ইংলণ্ডেও কান্টিয় দর্শনের সম্যক উপলব্ধি হয় নাই, হেগেলীয় দর্শনের উপক্রমণিকা হিসাবেই সেদিন ইংরেজ কান্টিয় দর্শনের আলোচনা করিয়াছে। আজ কিন্তু দৃষ্টির মোড় ফিরিয়াছে, এবং তাহার ফলে বর্ত্তমানের দার্শনিকের কাছে কান্টিয় দর্শনের তুলাদণ্ডেই হেগেলীয় দর্শনের বিচার। নানান কারণে দৃষ্টির এ পরিবর্ত্তন, সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার এখানে প্রয়োজন নাই, তবে সেই পরিবর্ত্তনের ফলে আজ কান্টিয় দর্শনের বিচার নূতন করিয়া সুরু হইয়াছে এবং তাহারই খানিকটা পরিচয় দেওয়া এই পুস্তিকার লক্ষ্য।

কান্টিয় দর্শনের দুর্ব্বোধ্যতা প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়াছেন, যদিও বহুক্ষেত্রে সে দুর্ব্বোধ্যতা যে ভাষ্যকারেরই সৃষ্টি, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ভাষ্যকারের অক্ষমতা বা অপরাধ মানিয়া লইলেও কিন্তু কাণ্টকে সহজ বলা চলে না, এবং তাঁহার দর্শন সাধনার মধ্যেই এই দুরূহতার কারণ মেলে। তাঁহার মতে পূর্ব্বের সমস্ত সহজ সিদ্ধান্ত এবং

সমাধানই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে, তাই দর্শনকে যদি আবার নূতন করিয়া স্থাপিত করিতে হয়, তবে কঠিন পথে না চলিয়া উপায় নাই। বিজ্ঞানের পদ্ধতি দর্শনে প্রয়োগ করিতে গিয়া অবশেষে সে পদ্ধতির সংকোচন ও সীমানির্দ্দেশেই কান্টিয় দর্শনের পরিসমাপ্তি, এবং সুরু ও সারার মধ্যে এই রূপান্তর তাঁহার দর্শন সাধনাকে আরো জটিল করিয়া তুলিয়াছে। বাঙলায় এ সম্বন্ধে বই লেখা যে দুঃসাহসের পরিচায়ক, সে কথা বোধ হয় সহৃদয় পাঠক মাত্রই স্বীকার করিবেন, এবং সেই দুঃসাহসের অজুহাতেই পুস্তিকার সমস্ত দোষ-ত্রুটীর জন্য তাঁহাদের কাছে অনুমোদন বা অন্ততপক্ষে ক্ষমার দাবী করিব। বহু ক্ষেত্রেই ইংরিজি শব্দের প্রতিশব্দের অভাব অনুভব করিয়াছি, কারণ বাঙলায় দার্শনিক শব্দ-সংগ্রহ এখনো গড়িয়া উঠে নাই বলিলেও চলে। সংস্কৃতের বিপুল ভাণ্ডার হইতে শব্দ আহরণ করিতে পারি নাই, আমার সংস্কৃত জ্ঞানের একান্ত অভাব তাহার একমাত্র কারণ নহে। আমার বিশ্বাস যে সংস্কৃতে শব্দের যে দার্শনিক সংজ্ঞা আছে, বাঙলায় বহুক্ষেত্রেই তাহার লঙ্ঘন হইয়াছে। "সামান্য" বলিলে বাঙলায় স্বল্পেরই ছায়া মনে আসে, তাহার বিশ্বরূপের আভাষ তাহার মধ্যে নাই। এসব ক্ষেত্রে "সার্ব্বিকের" মতন নূতন কথা ব্যবহারই আমার সঙ্গত মনে হইয়াছে।

পুস্তিকাখানির কতক কতক অংশ "পরিচয়ে" প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং অন্যান্য যে সমস্ত বন্ধুর আগ্রহে এ প্রবন্ধগুলির রচনা, তাহাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বাঙলায় এ ধরণের বইয়ে নূতনত্বের দাবী

হস্ত্যকর, সাধারণ শিক্ষিত পাঠক এবং যাঁহারা দর্শনের ছাত্র, তাঁহাদের কাছে যদি বাঙলা ভাষায় কান্টের দার্শনিক তত্ত্বের সাধারণ বর্ণনাও বোধগম্য করিয়া আনিতে পারি, তবে আমার শ্রম সার্থক মনে করিব।

পরিশেষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বাঙলা প্রকাশ বিভাগের শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায় এবং শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেডের শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়কে ধন্যবাদ জানাইতেছি কারণ তাঁহাদের সহযোগিতা ভিন্ন এ পুস্তিকা এত সত্বর প্রকাশ সম্ভব হইত না।

কলিকাতা
শ্রাবণ, ১৩৪৬

হুমায়ুন কবির

ইমান্নুয়েল কাণ্ট

দর্শনের সম্বন্ধে প্রায়ই একথা বলা হয় যে এতখানি উদ্যমের এত অপব্যয় বোধ হয় জ্ঞানরাজ্যের আর কোন প্রদেশেই ঘটে নাই। ইতিহাসের আদিযুগ হইতে মানুষ দর্শনের সমস্যা লইয়া ভাবিযাছে, কত জ্ঞানী কত বৃদ্ধ আপনার জীবন পণ করিয়া সৃষ্টির রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু সমস্ত প্রয়াসকে ব্যঙ্গ করিয়া সৃষ্টির রহস্য চিরকাল রহস্যই রহিয়া গিয়াছে। অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রেই মানুষের জ্ঞান প্রগতি-শীল, নিত্য নব আবিষ্কারে বিশ্বের নূতন নূতন তত্ত্ব বুদ্ধির আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে, সহস্র কর্ম্মীর সম্মিলিত সাধনা সেখানে একলক্ষ্য হইয়া সত্যের আপন সত্তা প্রকাশে উন্মুখ।

জ্ঞানের লক্ষণই এই যে জ্ঞান সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বকালিক। স্থান-কাল-পাত্রভেদে তাই জ্ঞানের বিকার হয় না,—যাহা সত্য তাহা চিরকালের জন্য সকলের কাছেই সত্য। দর্শনের ক্ষেত্রে কিন্তু মনে হয় যে পদে পদে আমরা তাহার ব্যতিক্রম দেখি, একজন দার্শনিক যাহাকে সত্য মনে করিয়া অকুণ্ঠিত চিত্তে বিশ্বের সম্মুখে প্রচারিত করেন, অন্য দার্শনিকেরা ঠিক তাহাকেই ঠিক তেমনি অকুণ্ঠায় মিথ্যা বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে চান। জ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রেও যে মতভেদ হয় না, তাহা নহে, কিন্তু সে সমস্ত ক্ষেত্রেই মতভেদের মীমাংসা সাধিত না হইলেও সম্ভবপর। উদাহরণ-স্বরূপ ইতিহাসের কথা বলা যায় যে কোন একটি বিশেষ ঘটনা সম্বন্ধে মতভেদ যতই থাকুক না কেন, সেবিষয়ে সর্ব্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া একেবারে অসম্ভব নহে। যেখানে ইতিহাস দর্শনের সঙ্গে সমন্বয়ের ফলে তথ্য ছাড়িয়া তথ্যের মূল্যবিচারে প্রবৃত্ত হয়, ঘটনার ঐতিহাসিকতার

বিচারের বদলে তাহার গুরুত্ব এবং তাৎপর্য্য বুঝিতে চেষ্টা করে, কেবলমাত্র সেই সমস্ত ক্ষেত্রেই ইতিহাসের মতভেদের কোন সমাধান অসম্ভব। কিন্তু সে সব ক্ষেত্রে ইতিহাস আর ইতিহাস থাকে না—তাহা দর্শন হইয়া দাঁড়ায়।

দর্শনের ক্ষেত্রে এরকম মতদ্বন্দ্বের কারণ সহজেই বোঝা যায়। জ্ঞানের প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই জ্ঞানেব বিষয় এবং প্রতিমানের পার্থক্য লক্ষ্যণীয়, তাই প্রত্যেক বিষয়কেই প্রমাণ বা অপ্রমাণ করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। দর্শনের ক্ষেত্রে এ পার্থক্যের কোন স্থান নাই, প্রমাণকেই দর্শন অনুসন্ধিৎসার বিষয়বস্তু বলিয়া গণ্য করে। চরম সত্যেব সন্ধানেই দর্শনে এ পদ্ধতি অবলম্বিত, কিন্তু ফলে দর্শনের জ্ঞান সকল ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতির নামান্তর হইয়া দাঁড়ায়। এই জন্যই দার্শনিকের সঙ্গে দার্শনিকের মতভেদ, কিন্তু অন্যপক্ষে প্রত্যেক দার্শনিকই আপনার মতকে কেবলমাত্র মত না বলিয়া সার্ব্বিক সত্যরূপে উপস্থাপিত করেন।

একদিকে দার্শনিকের সঙ্গে দার্শনিকের মতভেদ, বিভিন্ন মতের নৈরাজ্য এবং তাহার ফলে দর্শনের সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহ। অন্যদিকে মানবচিত্তের অদম্য আগ্রহে দর্শনের উৎপত্তি, দর্শনের সমস্যা লইয়া মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির উৎকণ্ঠা। দর্শনকে যাহারা কেবলমাত্র বুদ্ধির বিলাস বলিয়া বর্জ্জন করিতে চায়, জনপ্রবাদের ভাষায় তাহাদিগকে বলিতে হয়, "কম্বলকে আমি ছাড়তে চাইলেও কম্বল তো আর আমাকে ছাড়ে না!" দর্শনকে ছাড়িতে চাহিলেও দর্শন যে আমাদেব ছাড়ে না।

মানুষের চিন্তাবৃত্তির এই উদ্যম এবং তাহার আপাতব্যর্থতার এই দৃশ্যও দর্শনেরই সমস্যা। পৃথিবীতে সব কিছুরই যদি কোন না কোন কারণ থাকে,—এবং কারণ আছে কি নাই সেকথাও দর্শনের বিবেচ্য,—তবে মানুষের চিত্তের এই অনুসন্ধিৎসারই বা কারণ কি? দর্শন যদি মানুষের আয়ত্তাতীত হয়, তবে দর্শন-রচনার প্রেরণাই বা রহিয়াছে

কেন? প্রতি যুগেই দার্শনিক এ প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং সে উত্তর সে যুগের দর্শনের সাধনাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। দর্শনে আজও যে যুগ চলিতেছে, তাহার প্রশ্ন এবং তাহার মীমাংসার মূলে রহিয়াছে কাণ্টের দর্শন। তিনি যে ভাবে এ সমস্যাকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহাই এ যুগের দার্শনিকদের বিশ্বদৃষ্টিকেও অনুরঞ্জিত করিয়াছে। আমাদের মত কাণ্টবাদী বা কাণ্টবিরোধী হইতে পারে, কিন্তু কাণ্টকে অস্বীকার করিতে চাহিলেও সেই কাণ্টেরই ভাষা ব্যবহার না করিয়া তাই আমাদের আর কোনও উপায় নাই।

এক

কাণ্টের সম্বন্ধে এককালে আমাদের ধারণা ছিল যে শুষ্কচিত্ত রসজ্ঞানহীন এক বৃদ্ধ অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনায় দীর্ঘজীবন যাপন করিয়া প্রৌঢ় বয়সে যে গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাই তাঁহার একমাত্র পরিচয়। তাই কাণ্টের এক জীবনীকারের মতে 'কাণ্টের জীবনও ছিল না, কোন ইতিহাসও ছিল না, কাজেই তাঁহার জীবনের ইতিহাস লেখা সম্ভব নয়। কলের পুতুলের মতন নিয়মিতভাবে প্রৌঢ়ের দিন কাটিত। তাঁহার অবিবাহিত জীবনে কোনদিন রূপ, রস, গন্ধের স্পর্শও লাগে নাই। নিদ্রাভঙ্গের পরে প্রাতঃকৃত্য সমাপন ও কফিপান, ছাত্রদের অধ্যাপনা ও মধ্যাহ্ন-ভোজন, সায়াহ্ন-ভ্রমণ এবং গৃহে ফিরিয়া অধ্যয়ন ও রচনা,—সমস্তই ঘড়ির কাঁটার মতন নিয়মিতভাবে তিনি সম্পন্ন করিতেন। তাই ধূসর-বেশ কাণ্টের মূর্ত্তি দেখিয়া নগরবাসীরা সময় নির্দ্ধারণ করিত, জানিত যে তাঁহার জীবনে মুহূর্ত্তেরও ব্যতিক্রম কেহ কোনদিন লক্ষ্য করে নাই।'

এ ধারণার মূলে যে অনেকখানি সত্য রহিয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। তাঁহার যে রচনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় নিবিড়, তাহার মধ্যে তাঁহার মনুষ্যধর্ম্মের পরিচয়

প্রবল নহে, সত্যসন্ধানের প্রখর আগ্রহে যুক্তিতর্কের নির্ম্মম পরাবর্ত্তন ছাড়া অন্য কিছুরই সেখানে স্থান নাই। সে আলোচনাকে তাই জীবন হইতে বড় বেশী বিচ্ছিন্ন মনে হইতে পারে, এবং মানুষটিকেও আমরা কেবলমাত্র নিরাবেগ যুক্তি-যন্ত্র মনে করিতে পারি, কিন্তু কাণ্টের জীবনেরও অন্য অনেক দিক ছিল। তাঁহাকে বুঝিতে হইলে সে সমস্ত দিককেও অগ্রাহ্য করা চলে না।

বিলিয়ার্ড এবং তাস খেলিয়া কাণ্ট ছাত্রজীবনের খরচের অংশ জোগাইতেন শুনিলে তাই আশ্চর্য্য লাগে। নিজে মিতাহারী হইলেও তাঁহার মধ্যাহ্ন ভোজনের মজলিসে সামাজিক জীবনের যে প্রবাহ বহিত, তাহা দেখিয়া তাঁহার শুভানুধ্যায়ী বন্ধুদের প্রায়ই মনে হইত যে জনসঙ্গ যাঁহার এত প্রিয়, তাঁহার পক্ষে দর্শন রচনা হয়তো সম্ভবপর হইয়া উঠিবে না। তখনকার দিনে পরিচিতেরা তাঁহাকে তাই সুধী অপেক্ষা সুপ্রিয় বলিয়াই জানিত, ছাত্রেরা মুক্তকণ্ঠে বলিত যে দার্শনিক কাণ্ট কেবলমাত্র দুর্ব্বোধ্য নহে, অবোধ্যও বটে, কিন্তু শিক্ষক কাণ্টের তুলনা মেলে না। লিণ্ডসে তাঁহার নূতন গ্রন্থে কাণ্টের জীবনের এই দিকটি প্রকাশিত করিয়া সেই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে প্রৌঢ় বয়সে কাণ্ট হয়তো আমাদের কল্পনারচিত রসহীন যুক্তিসর্ব্বস্ব শুষ্কচিত্ত দার্শনিক মাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার দর্শনের মর্ম্মকথা জানিতে হইলে আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে এ ছবি কাণ্টের জীবনের শেষ বয়সের ছবি, দর্শনের সাধনা সম্পন্ন করিয়া খ্যাতিলাভের পরে তাঁহার যে জীবন, ইহাতে কেবল তাহাই প্রকাশিত হইতেছে। যে কাণ্ট দর্শন রচনা করিতেছিলেন, তাঁহাকে জানিতে হইলে

আমাদের এই প্রচলিত ধারণার পরিবর্ত্তে যে মূর্ত্তির কথা ভাবিতে হইবে, সে ছবি যুবক কাণ্টের, ফোরলেণ্ডারের ভাষায় সে কাণ্ট ছিলেন রসিক পুরুষ। তাঁহার দর্শনের ব্যাপকতা বুঝিতে হইলে, তাঁহার জীবনের প্রসারের কথাও স্মরণ রাখা আবশ্যক।

কেহ হয়তো জিজ্ঞাসা করিবেন যে কাণ্ট রসিক পুরুষ ছিলেন না রসজ্ঞানহীন যুক্তিযন্ত্র ছিলেন, তাহা জানিয়া আমাদের লাভ কি? তাঁহার দর্শনের প্রকাশ তো তাঁহার রচনায়ই রহিয়াছে, তাহার পরিচয় জানিলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ, তাঁহার চরিত্রবিচারে আমাদের প্রয়োজন কি? এ কথার উত্তরে বলিতে হয় যে দর্শন ব্যক্তিবিশেষের অভিজ্ঞতাসঞ্জাত বলিয়া যতই ব্যক্তিনিরপেক্ষ হইতে চাহুক না কেন, কোনকালেই সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বনিরপেক্ষ হইতে পারে না। ব্যক্তিনিরপেক্ষ বলিয়া সত্যের সার্ব্বজনীনতার আভাস দর্শনে আমরা পাই, কিন্তু ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে পারে না বলিয়া সে সার্ব্বিকতা আপেক্ষিক। সে সম্বন্ধে আরো বলা চলে যে ব্যাপকতাই দর্শনের প্রাণ, অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যের সংশ্লেষণেই তাহার বৈশিষ্ট্য। তাই যাহার জীবনের অভিজ্ঞতা যত গভীর, দর্শনের প্রয়োজনীয়তাও তাহার পক্ষে তত তীব্র, এবং দর্শন-রচনার অবকাশ ও সম্ভাবনাও তাহার জীবনে তত অধিক। নিরুদ্ধ বা বঞ্চিত জীবনে দর্শন বিকাশ লাভ করে না—জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার সামঞ্জস্যসাধনই দর্শন। তাই দর্শনের অন্য নাম বিশ্বদৃষ্টি, এবং বিশ্বদৃষ্টি বলিয়াই ব্যক্তি হইতে ব্যক্তিবিশেষে তাহা বিভিন্ন হইতে বাধ্য। কাণ্টের ভাষায় তাই বলিতে হয় দর্শন বলিয়া কিছুই নাই, দর্শন তাই

কেহ কাহাকেও শিখাইতেও পারে না, দার্শনিক মনোবৃত্তি এক চিত্ত হইতে অন্য চিত্তে সংক্রামিত হয় মাত্র। দর্শনের সত্যের এই আপেক্ষিকতা স্বীকার করিলেই দার্শনিকের মনোবৃত্তি আমাদের কাছে তাঁহার দর্শন অপেক্ষাও অধিক মূল্যবান বলিয়া প্রতিভাত হয়, কারণ সেই মনোবৃত্তির বিচার করিয়া আমরা তাঁহার দর্শনের যৌক্তিকতা বা প্রয়োজনীয়তার বিচার করিতে পারি। ফলে দার্শনিক কী বলিয়াছেন, তাহার পরিবর্ত্তে কেন তিনি এমন কথা বলিলেন এই বিচারই আমাদের লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়, এবং সে আলোচনায় মানবমনের কর্ম্মপদ্ধতি আমাদের জ্ঞানগোচর হইয়া আমাদের নিজেদের বিশ্বদৃষ্টিকে সমৃদ্ধ করিয়া তোলে।

দার্শনিকের ব্যক্তিত্ববিচার তাই দর্শনের লক্ষ্যের বাহিরে নহে, বরং দর্শনের উপলব্ধির একটি প্রধান উপকরণ। কাণ্টের বেলায় দর্শনের এ সাধারণ নিয়মটি আরো বেশী করিয়া প্রযোজ্য, কারণ তাঁহার মানস-ইতিহাস এবং চরিত্রের সংগঠন না জানিলে তাঁহার দর্শনের যৌক্তিকতা বোঝাও অসম্ভব। তিনি যে দর্শনের অধ্যাপক এবং সে হিসাবে দর্শন-ব্যবসায়ী, এ কথা মনে না রাখিলে তাঁহার দর্শন-বিচারে আমাদের প্রতি পদে ভুল হওয়া অবশ্যম্ভাবী। তাঁহার দর্শনের অনভ্যস্ত রূপ এবং তাঁহার সমস্যা ও সমাধানের অদ্ভুত পরিকল্পনার কারণও এইখানেই মিলে, কারণ অতীত দর্শনের ইতিহাস কাণ্টের দর্শনজিজ্ঞাসাকে অনুরঞ্জিত করিয়াছিল বলিয়াই তাহা আপনার বিশিষ্ট গতি ও অভিমুখ পাইয়াছিল। হেগেল নিজের দর্শনের সম্পর্কে বলিয়াছিলেন যে দর্শনের ইতিহাসই দর্শন। কিন্তু একথা সমানভাবে কাণ্টের বেলাও প্রযোজ্য। দর্শনের

বিভিন্ন মতের সঙ্গে তাঁহার নিবিড় পরিচয় ছিল বলিয়াই তাহাদের বিভিন্ন সাফল্য এবং ব্যর্থতাকে একত্রিত করিয়া জ্ঞানের নূতন সামঞ্জস্য সাধনার চেষ্টায় তাঁহার দর্শন। এই সামঞ্জস্য সাধনের প্রয়াসই তাঁহার দর্শনের মূলমন্ত্র এবং শতাব্দীর ইতিহাসের অভিব্যক্তির ফলে তাহা তাঁহার সম্মুখে যে সমস্যা উপস্থাপিত করিয়াছিল তাহার মর্ম্মকথাকে প্রকাশ করিয়া বলা যায়—একদিকে বিজ্ঞানের বিজয় অভিযান এবং তাহার ফলে সৃষ্টির সমস্ত রহস্যের যান্ত্রিক বিবরণে পৌর্ব্বাপর্য্যের অলঙ্ঘনীয় সূত্রের শৃঙ্খল, অন্যদিকে মানবাত্মার আত্মোপলব্ধি ও গৌরববোধে এই যান্ত্রিকতার সার্ব্বিকতাকে অস্বীকার। স্বভাবের নিয়মে যদি বিশ্বসৃষ্টির সমস্ত কিছুকেই বোঝা যায়, তাহাদের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে, তবে আত্মার স্বাধীনতা কই, মানুষের কর্ম্মফলের জন্য তাহার দায়িত্ববোধের অর্থ কি?

দুই

আধুনিক জগতের মনোবৃত্তির দিকে লক্ষ্য রাখিলে বলা চলে যে ইহা বিশেষ করিয়া বিজ্ঞানের যুগ। এ যুগে বিজ্ঞানের যুগান্তরকারী প্রগতির প্রতি লক্ষ্য করিলে এ কথা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু কেবলমাত্র সে প্রগতির দিকে দৃষ্টি না রাখিয়াও আধুনিক যুগকে বিজ্ঞানের যুগ বলা চলে। বিজ্ঞানের নিত্য নব আবিষ্কার, নূতন নূতন অভিযান এবং নবীন পদ্ধতি আমাদের চিরাচরিত জীবনকে রূপান্তরিত করিয়াছে সত্য, কিন্তু সেই রূপান্তর জীবনের প্রচলিত ধারাকে অতিক্রম করিয়া আমাদের মানস-গঠন ও বিশ্বদৃষ্টিকেও রঞ্জিত করিয়াছে বলিয়াই বর্ত্তমান যুগকে বিজ্ঞানের যুগ বলা সার্থক।

বিভিন্ন কালে বিভিন্ন মনোবৃত্তির ফলে পৃথিবীতে বিভিন্ন সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে, ইতিহাসে তাহার সাক্ষ্য মেলে। সভ্যতার এ বৈচিত্র্যের অর্থ ইহা নয় যে কোন বিশেষ দেশ বা কালের সভ্যতার উপাদান অবিমিশ্র। মানবচরিত্র এবং মানবসমাজের জটিল সংগঠনের দিকে দৃষ্টি রাখিলে এ কথার সত্য সহজেই প্রতীয়মান হইবে। রূপবোধ, নৈতিকতা অথবা ধর্ম্মান্বেষণার প্রবলতা বিশেষ দেশ অথবা যুগের বিশ্বদৃষ্টিকে রঞ্জিত করিয়া সমসাময়িক সভ্যতার অভিমুখ ও সংগঠন নির্দ্দেশ করিতে পারে, কিন্তু সে নির্দ্দেশের ফলে মানবচিত্তের অন্যান্য বৃত্তিসমূহ নিষ্পেষিত হয় না, কেবলমাত্র রূপান্তরিত হয়। ফলে মানবসভ্যতার বৈচিত্র্য উপাদানমূলক

নহে, সংগঠনমূলক। সমস্ত সভ্যতার ক্ষেত্রেই একই প্রকারের উপাদানসমূহ ক্রিয়াশীল, কেবলমাত্র বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপাদানের প্রাধান্যে ও সংগঠনের পার্থক্যে সভ্যতার অবয়ব ও মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রকাশ পায়।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে সভ্যতা হিসাবে প্রাচীন চৈনিক সভ্যতা বোধ হয় পৃথিবীর অন্য যে কোন সভ্যতার অপেক্ষা হীন নহে। প্রাচীন চীনের রূপসাধনা, সাহিত্যসৃষ্টি অথবা সমাজ-সংগঠনের কথা মনে করিলে আজিও আমাদের আশ্চর্য্য লাগে। জীবনযাত্রার ধারা বিচার করিলেও চীন সভ্যতার উৎকর্ষ বিস্ময়কর মনে হয়। কালপ্রবাহের দৈর্ঘ্য এবং নরনারীর সংখ্যা বিবেচনায় বলা চলে যে বিশ্বসভ্যতার বিকাশে চীনের স্থান প্রায় সর্ব্বোচ্চে, অথচ এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে চীনসভ্যতার সে বিকাশে বিজ্ঞানের স্থান অতি নগণ্য। ব্যক্তি হিসাবে যে চীনবাসী বিজ্ঞানে প্রতিভার পরাকাষ্ঠা দেখাইতে পারেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু জাতি অথবা সভ্যতা হিসাবে যে চৈনিক চিত্ত বিজ্ঞানে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করে নাই, সে কথাও সমানই নিঃসন্দেহ। চীনবাসীর চরিত্র অথবা বুদ্ধির অভাবের কথা এ প্রসঙ্গে উঠিতে পারে না, কারণ দর্শন, সাহিত্য এবং রূপসৃষ্টিতে চৈনিক চিত্ত যুগযুগান্ত ধরিয়া যে স্থির সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়া আসিয়াছে, বিশ্বের ইতিহাসে তাহার তুলনা অধিক মেলে না। ভারতবর্ষ অথবা পারস্যের সভ্যতা সম্বন্ধেও বোধ হয় এ কথা বলা চলে। এই সমস্ত সভ্যতায় বিজ্ঞানের বিকাশ হয় নাই, এ কথা মনে করিলে কিন্তু ভুল হইবে। অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য ও আবিষ্কারের ইতিহাসই

এই সভ্যতাসমূহের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত, কিন্তু বিজ্ঞানের সে বিকাশ এ সকল সভ্যতার মর্ম্মকথা নহে।

আধুনিক যুগকে বিজ্ঞানের যুগ বলিবার অর্থ এইখানেই মেলে। কোন একটী বিশেষ আবিষ্কারের তুলাদণ্ডে বিচার করিলে আধুনিক যুগের বিজ্ঞানের বিকাশকে পূর্ব্ববর্ত্তী যুগসমূহের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলা চলে কি না, সে কথা বিচারের বিষয়। কিন্তু বিশেষ আবিষ্কারের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া যদি যুগধর্ম্ম এবং মানুষের বিশ্বদৃষ্টি দিয়া আমরা সভ্যতার স্বরূপ নির্ণয় করিতে চাহি, তবে আধুনিক সভ্যতা যে একান্তভাবে বিজ্ঞানধর্ম্মী সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। প্রাচীন সভ্যতায় বিজ্ঞান ছিল মানুষের চিত্তবৃত্তির বিচিত্র সাধনার উপাদানসমূহের মধ্যে একটী মাত্র উপাদান,—বর্ত্তমান কালে বিজ্ঞান সেই সাধনার ধারানির্দ্দেশক।

আধুনিক যুগে মানুষের চিত্তবৃত্তির সমস্ত প্রকাশের ক্ষেত্রেই এই বৈজ্ঞানিক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সভ্যতাকে বুঝিতে হইলে তাই এই বৈজ্ঞানিক মনোভাব এবং বিজ্ঞানের পদ্ধতির তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিকে বিশ্লেষণ করিয়া বলা চলে যে বিশ্বসৃষ্টির প্রকাশ শৃঙ্খলাবদ্ধ, এই বিশ্বাসই তাহার মূল। প্রকৃতির পর্য্যায়ে সহজ বিশ্বাস না থাকিলে বিজ্ঞানের বিকাশ অসম্ভব, তাই এই বিশ্বাসের আবির্ভাবের ফলেই অসভ্য যুগের যাদুবিদ্যা বিজ্ঞানে রূপান্তরিত হয়। বৈজ্ঞানিকের সজ্ঞান মতবাদ যাহাই হউক না কেন—এবং অনেক স্থলেই সে মতবাদ একান্তরূপে অভিজ্ঞতানির্ভর বলিয়া শৃঙ্খলার সার্ব্বিকতায় অবিশ্বাসী—তাঁহার বৈজ্ঞানিক

গবেষণাই প্রমাণ করে যে প্রকৃতির পর্য্যায়ে সহজ বিশ্বাস তাঁহার স্বধর্ম্ম। দর্শনের সিদ্ধান্ত হিসাবে তাই বৈজ্ঞানিক বহু স্থলেই হিউমের সন্দেহবাদকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু সাধনার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিকের নিষ্ঠা দর্শনের সেই অলঙ্ঘ্য পর্ব্বতকেও অক্লেশে লঙ্ঘন করিয়া যায়।

প্রকৃতির শৃঙ্খলায় বিশ্বাস তাই বিজ্ঞানের ভিত্তি, কিন্তু কেবল মাত্র সাধারণ ভাবে এ বিশ্বাসকে বরণ করিয়া লইলে বিজ্ঞানের সাফল্যের কোন বিবরণ দেওয়া চলে না। পৃথিবীর সমস্ত সভ্যতার মূলেই এ বিশ্বাস রহিয়াছে, জগৎ-প্রপঞ্চের বৈচিত্র্যের মধ্যে স্থৈর্য্যের এ সন্ধান না পাইলে মানুষের চিত্ত অভিজ্ঞতাকে সুসংবদ্ধ করিবার কথা কল্পনায়ও আনিতে পারিত না। সুতরাং কেবলমাত্র এই বিশ্বাসকে ভিত্তি করিয়া বিজ্ঞানের বিশেষ মনোবৃত্তিকে বুঝিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইতে বাধ্য, কারণ মানবচিত্তের অন্যান্য বিকাশেও এ বিশ্বাস কার্য্যকরী, তাই তুলনায় বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য ইহাতে প্রকাশ পায় না। বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য বিশেষের সঙ্গে বিশেষের সম্বন্ধ স্থাপনে। এক পক্ষে এ সম্বন্ধ সার্ব্বিক সম্বন্ধ, কারণ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষের সাংখ্যিক বা স্থানকালগত বৈশিষ্ট্যকে লক্ষ্য করিবার অবকাশ নাই। বিশেষের স্বভাব বা লক্ষণ বিচার করিয়া সেই লক্ষণের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াই বিজ্ঞান তৃপ্ত। সেই লক্ষণের পুনরাবির্ভাব হইলে সেই সম্বন্ধেরই পুনরাবির্ভাবও অবশ্যম্ভাবী, ইহাই বিজ্ঞানের নির্দ্দেশ। অন্য পক্ষে এ সমস্ত সার্ব্বিক সম্বন্ধও বিশেষের বিশিষ্ট স্বভাববিচারের ফলে আবিষ্কৃত। বিশ্বসৃষ্টি নিয়মানুবর্ত্তী, প্রকৃতির সমস্ত প্রকাশই শৃঙ্খলা মানিয়া চলে,—

পৃথিবীর ধারাবাহিকতায় এ সাধারণ বিশ্বাস বিজ্ঞানের পক্ষে যথেষ্ট নহে। তাই বিজ্ঞান সৃষ্টিকে নিয়মানুবর্ত্তী বলিয়া তৃপ্ত নহে, বিচিত্র সৃষ্টির বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে বিশিষ্ট নিয়ম আবিষ্কারই তাহার লক্ষ্য, প্রকৃতির বিশিষ্ট প্রকাশের মধ্যে বিশিষ্ট শৃঙ্খলাস্থাপনেই তাহার সিদ্ধি। কার্য্যকারণ-বিধির উদাহরণ দিয়া বলা চলে যে কার্য্যকারণ-বিধির সর্ব্বব্যাপকতায় বিশ্বাস বিজ্ঞানের ধর্ম্ম হইতে পারে, কিন্তু তাহার সাধনা বিশিষ্ট ক্ষেত্রে বিশেষের মধ্যে বিশিষ্ট কার্য্যকারণ-বিধির আবিষ্কার।

সৃষ্টির প্রত্যেকটী ঘটনাই তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাসমূহের সঙ্গে অলঙ্ঘ্য নিয়মের সূত্রে আবদ্ধ—এই বিশ্বাসই বিজ্ঞানের ভিত্তি। এই বিশ্বাসের বলেই বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির রহস্য নির্ণয়ের জন্য অমানুষিক পরিশ্রম করিতে সমর্থ। কিন্তু একটু বিচার করিলেই দেখা যাইবে যে এ বিশ্বাসের ফলে বিশ্বসৃষ্টির সর্ব্বত্রই যান্ত্রিকতার অমোঘ বিধানে বিশ্বাস করিতে আমরা বাধ্য। যান্ত্রিকতার এ সর্ব্বব্যাপকতা কার্য্যকারণ-বিধির সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে ব্যগ্র, সৃষ্টির সমস্ত রহস্যের উপর বুদ্ধির অমিশ্র আলোক ফেলিয়া পৌর্ব্বাপর্য্যের অলঙ্ঘ্য সূত্রের শৃঙ্খলে তাহাকে প্রকাশ করিতে উৎসুক।

যান্ত্রিকতার এ বিজয়-অভিযান বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম হইলেও মানবচিত্ত দুই দিক হইতে তাহাকে বাধা দিতে অগ্রসর হয়। কার্য্যকারণ-বিধির সম্প্রসারে যান্ত্রিকতার রাজ্যস্থাপন বিজ্ঞানের লক্ষ্য, কিন্তু বিজ্ঞানের পদ্ধতির মধ্যেই সে সাধনার পথে বাধা রহিয়াছে। বিজ্ঞান বিশেষকে ভিত্তি করিয়া সৌধ রচনায় রত, কিন্তু বিশেষের প্রতি একান্তভাবে বদ্ধদৃষ্টি বলিয়া

বিজ্ঞান অভিজ্ঞতানির্ভর। বৈজ্ঞানিক চিত্তবৃত্তির পরাকাষ্ঠা তাই হিউমের সন্দেহবাদে, কিন্তু সে সন্দেহবাদের মধ্যে বিজ্ঞানের সার্ব্বিক সূত্রের স্থান নাই, সেকথা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। ফলে বিজ্ঞানের মূলগত বিশ্বাস এবং তাহার সাধনার পদ্ধতি পরস্পর-বিরোধী। এই জন্যই কোন কোন দার্শনিক বিজ্ঞানকে জ্ঞান বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না, কারণ জ্ঞান স্বপ্রকাশ, তাহার মধ্যে অসঙ্গতি বা বিরোধের কোন স্থান নাই। তাঁহাদের মতে বিজ্ঞান তাই মানুষের কর্ম্মপদ্ধতি মাত্র, ব্যবহারিক জীবনে তাহার প্রয়োজনীয়তা এবং কার্য্যকারিতা যতই অধিক হউক না কেন, জ্ঞানের স্বপ্রকাশ সম্পূর্ণতার কোন চিহ্ন সেখানে নাই। একথা মনে করিবার আরো কারণ রহিয়াছে। কার্য্যকারণ-বিধি বিজ্ঞানের প্রাণমন্ত্র, যতদূর তাহার প্রসার, ততদূর পর্য্যন্তই বিজ্ঞানের সাম্রাজ্য, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে কার্য্যকারণ-বিধির স্বভাবের মধ্যেই স্ববিরোধ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কার্য্যকারণ-বিধি বিশেষ ঘটনাকে পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাসমূহের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ দিয়া বিচার করে, তাহার স্বভাবের সম্পূর্ণ পরিচয় পূর্ব্ববর্ত্তীদের স্বভাবের মধ্যেই পাইতে চাহে। ফলে বিশেষের বৈশিষ্ট্য ঘটনা-পর্য্যায়ের মধ্যে তাহার অবস্থানের ফল বলিয়া প্রতিভাত হয়, কিন্তু অন্য পক্ষে স্বভাবকে অবস্থান-নিরপেক্ষ বলিয়া স্বীকার না করিলে বিজ্ঞানের সার্ব্বিক সূত্র অর্থহীন হইয়া দাঁড়ায়।

এই স্ববিরোধের ফলেই বৈজ্ঞানিক কর্ম্মপদ্ধতির তাৎপর্য্য লইয়া দার্শনিকদের মধ্যে এত মতভেদ। বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা-নির্ভরতা ও বৈশিষ্ট্যবোধের উপর যাঁহারা আস্থা স্থাপন

করিয়াছেন, তাঁহাদের মতে বৈজ্ঞানিক কর্ম্মপদ্ধতির তাৎপর্য্য নিরীক্ষা ও পরীক্ষায়। তাহার ফলে যে সংযোজক বাক্য আবিষ্কৃত হয়, তাহাতে আমাদের জ্ঞানের বৃদ্ধি, কিন্তু সে বৃদ্ধির মধ্যে সার্ব্বিকতার অবকাশ নাই বলিয়া বস্তুতপক্ষে জ্ঞানের সে বিকাশ কেবলমাত্র আপাতদৃষ্ট, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। অন্য পক্ষে বিজ্ঞানের সার্ব্বিক জ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়া বিরুদ্ধ মতাবলম্বী দার্শনিকেরা বলিয়াছেন যে সম্বন্ধের সার্ব্বিকতার উপরই বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত, তাই প্রত্যয়ের সঙ্গে প্রত্যয়ের স্বভাবযোগ বিচার করিয়াই বিজ্ঞানের পরিণতি। গণিত তাই বিজ্ঞানের প্রতীক, এবং গণিতের সার্ব্বিক সূত্রে যাহা প্রকাশিত হয়, তাহাই প্রকৃত-পক্ষে বিজ্ঞানের বিষয়। ফলে বস্তুর দেশকালগত অবস্থান বিজ্ঞানের বিচারে অপ্রাসঙ্গিক, এমন কি নিরীক্ষা ও পরীক্ষাও বস্তুতপক্ষে বিজ্ঞানের অপরিণতির সাক্ষ্য মাত্র। বিজ্ঞানের পরিণতির ফলে তাহাদিগকে বর্জ্জন করিয়া গণিতের সার্ব্বিক সূত্রে বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত রহস্যই এক দিন উদ্ভাসিত হইবে।

একপক্ষে আপনার কর্ম্মপদ্ধতির স্ববিরোধ যান্ত্রিকতার সর্ব্বব্যাপী বিজয় অভিযানের অন্তরায়। অন্যপক্ষে মানুষের আত্মোপলব্ধি এবং চিত্তবৃত্তির আদর্শবোধ এ অভিযানকে অস্বীকার করিতে চাহে। সৌন্দর্য্যসৃষ্টিতে মানুষের আত্মা বিশ্বের যান্ত্রিকতাকে লঙ্ঘন করিয়া আপনার পূর্ণতার সন্ধান খোঁজে, নীতিবোধের গভীরতায় এবং কর্ত্তব্য-বুদ্ধির প্রেরণায় কার্য্যকারণ-বিধির অজানিত আদর্শকে বাস্তব বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়, ধর্ম্মান্বেষণার আহ্বানে বিজ্ঞানের সমগ্র আদেশ অনুদেশকে অগ্রাহ্য করিয়া পরম সত্যের সন্ধান করে। বিজ্ঞান

আপনার দৃষ্টিকোণ হইতে তাহাদের সত্যকে অস্বীকার করিতে চাহিয়াছে। বর্ত্তমান সভ্যতা প্রধানতঃ বিজ্ঞানধর্ম্মী বলিয়া সে সভ্যতার তুলাদণ্ডে বিজ্ঞানের তুলনায় সৌন্দর্য্য, নীতি অথবা ধর্ম্মবোধ অবহেলিত হইয়াছে, তাহাও সত্য, কিন্তু মানুষের চিত্ত বিজ্ঞানের সে দাবীকে কোনদিনই সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করিয়া লয় নাই। উনবিংশ শতাব্দার রোমান্তিক সাহিত্য ও শিল্প, এবং রাজনীতি ও সমাজনীতির ক্ষেত্রে তাহাদের প্রতিক্রিয়া বিজ্ঞানের এ সর্ব্বগ্রাসী অভিযানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। নীতি ও ধর্ম্মবোধও চিরদিনই বিজ্ঞানের সে যান্ত্রিকতাকে অস্বীকার করিতে চাহিয়াছে, প্রতিদিনের নিত্যকর্ম্মে সামাজিক মানুষও তাহার ব্যবহারে স্বভাবে বিশ্বাসে বিজ্ঞানের সে যান্ত্রিকতাকে কার্য্যত অগ্রাহ্য করিয়াই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। দ্বন্দ্বকে অগ্রাহ্য করিলেই দ্বন্দ্বনিরসন হয় না। তাই আধুনিক সভ্যতার আত্ম-অবিশ্বাস এবং আত্মঘাতী সন্দিগ্ধতার মূলও বোধ হয় এই দ্বন্দ্বেরই মধ্যে নিহিত।

কাণ্টের দর্শনের লক্ষ্যও তাই দুইটী। বিজ্ঞানের স্বভাবের মধ্যে যে বিরোধের সন্ধান মেলে, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য নিরূপন এবং সেই সূত্রে বিজ্ঞানের কর্ম্মপদ্ধতির পরিপূর্ণতর উপলব্ধি তাঁহার দর্শনসাধনার একটী প্রধান লক্ষ্য। বিজ্ঞানকে তাহার স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিয়াই কাণ্ট ক্ষান্ত হন নাই, তাহার অধিকারের সীমানির্দ্দেশ করিবার প্রয়াসও তাঁহার সাধনার অঙ্গীভূত। তাহার ফলে নীতি ও ধর্ম্ম-বোধের প্রেরণায় যে বিশ্বছবি আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়, সেই ছবির সঙ্গে বিজ্ঞানের যান্ত্রিক বিবরণের সমন্বয়সাধনও

তাঁহার দর্শনের অন্যতম লক্ষ্য। একপক্ষে বিজ্ঞানের কর্ম্ম-পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিবরণ দিয়া তাহার যৌক্তিকতা ও সত্য-সন্ধানকে তিনি সমর্থন করিতে চাহিয়াছেন, অন্যপক্ষে বিজ্ঞানের সঙ্গে আদর্শবোধের যে সংঘর্ষ, তাহার সমাধান করিয়া অভিজ্ঞতাকে তিনি পরিপূর্ণ ও সর্ব্বতোমুখী বলিয়া জানিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

তিন

বিশেষের ভিত্তির উপর সার্ব্বিক সূত্র স্থাপন কেমন করিয়া সম্ভবপর, এই সমস্যাই বিজ্ঞানের কর্ম্মপদ্ধতিতে সন্দেহ জাগাইয়া তোলে। বিজ্ঞানের সঙ্গে আদর্শ বোধের সংঘর্ষ সেই সমস্যারই বিপরীত দিক। কারণ বিজ্ঞানের সর্ব্বব্যাপী যান্ত্রিকতার মধ্যে ব্যক্তির স্বাধীনতা বা বৈশিষ্ট্যের অবকাশ নাই বলিয়াই আদর্শবোধের সঙ্গে বিজ্ঞানের সংঘর্ষ। তাই সমস্যা দুইটীর একটীর বিচার করিলেই সঙ্গে সঙ্গে অন্যটীরও বিচার অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সাধারণভাবে এরূপ সমস্যার বিচার করিতে চেষ্টা করিলে কোন সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নহে। তাই কাণ্ট সে দ্বন্দ্বকে যুক্তির রাজ্যে সীমাবদ্ধ রাখিয়া ন্যায়ের একটি বিশেষ সমস্যার মধ্যে তাহার সমাধান খুঁজিয়াছেন। সে সমস্যাটিকে প্রকাশ করিয়া বলা চলে যে, যে বাক্য কেবলমাত্র বাক্যার্থকে প্রকাশ করে না, বরঞ্চ ধারণার সঙ্গে ধারণার সংযোজন সাধন করে, সেইরূপ বাক্যকে সার্ব্বভৌম মনে করিবার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ আছে কি? কাণ্টের সমস্যা সুবৃহৎ—আত্মার স্বাধীনতার সঙ্গে বিশ্বব্যাপারের যান্ত্রিক বিবরণের দ্বন্দ্ব সমন্বয়, এবং বিজ্ঞানের কর্ম্মপদ্ধতিতে বিশেষের ভিত্তির উপর সার্ব্বিক সূত্রের প্রতিষ্ঠা। তাই প্রথম দৃষ্টিতে সেই বিপুল সমস্যা ও ন্যায়ের এই বিশিষ্ট প্রশ্ন,—বিশেষ এক প্রকার বাক্য ন্যায়-সঙ্গত কি না,—এই দুইয়ের মধ্যে অসঙ্গতি বড় বেশী বলিয়া মনে হয়, কিন্তু একটু আলোচনা করিলেই বোঝা যায় যে এ অসঙ্গতি

কেবলমাত্র আপাতদৃষ্ট, বস্তুতঃ ন্যায়ের এই সমস্যার মধ্যে দর্শনের বৃহত্তর সমস্যাও নিহিত। সংযোজক সার্ব্বভৌম বাক্য যুক্তিসঙ্গত কিনা, এই প্রশ্ন তুলিলেই প্রাক্‌কান্টিয় দর্শনের দারিদ্র্য প্রকাশিত হইয়া পড়ে, কারণ বুদ্ধিবাদী বা অভিজ্ঞতাবাদী কোন দার্শনিকই আপনার মতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া এরূপ বাক্যকে স্বীকার করিতে পারেন নাই।

সমস্যাটিকে সম্পূর্ণভাবে বুঝিতে হইলে ইয়োরোপীয় দর্শনের ইতিহাসের সঙ্গে খানিকটা পরিচয় থাকা দরকার। দর্শনসাধনার প্রারম্ভ হইতেই মানুষ লক্ষ্য করিয়াছে যে আমাদের জ্ঞানগোচর সমস্ত বস্তুরই দুইটি দিক আছে। অভিজ্ঞতায় আমরা প্রতিমূহূর্ত্তেই পরিবর্ত্তনের লীলা দেখিতে পাই, অন্যপক্ষে সে পরিবর্ত্তনের মধ্যেও স্থৈর্য্য না থাকিলে জ্ঞানলাভ অসম্ভব। ইন্দ্রিয় যে জগৎকে আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত করে, তাহা বিশিষ্ট বস্তুসমূহের সমষ্টি মাত্র। (ইন্দ্রিয় বস্তুকেও প্রকাশ করে কি না, তাহা লইয়াও প্রশ্ন ওঠে।) বিশিষ্ট হিসাবে তাহারা বিচ্ছিন্ন এবং বিচ্ছিন্ন বলিয়া তাহাদিগকে কোন সার্ব্বিক সূত্রে গাঁথিয়া প্রকাশ করা যায় না। অভিজ্ঞতা তাই নিত্য নূতন এবং প্রতিমুহূর্ত্তেই সঞ্জীবিত হইতেছে, এবং তাহার ফলে ইন্দ্রিয়গোচর বিশ্বে জ্ঞান মুহূর্ত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ, উপস্থিত স্থানকালকে অতিক্রম করিবার নির্দ্দেশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে নাই।

ইহাকেই যদি আমরা অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ বিবরণ মনে করি, তবে ন্যায়সঙ্গত ভাবে অভিজ্ঞতার কোন বিবরণই আমরা দিতে পারি না। যে সত্তা প্রতিমুহূর্ত্তের মধ্যে আবদ্ধ, সে যে কেবলমাত্র মুহূর্ত্তিক, সে কথাও সে জানিতে

পারে না। তাহার সত্তা মুহূর্ত্তে প্রকাশিত হইয়া মুহূর্ত্তেই বিলুপ্ত হয়, মুহূর্ত্তের সঙ্গে মুহূর্ত্তকে গ্রথিত করিয়া স্থান-কালের কোন ধারণাই সে সত্তার সাধ্যায়ত্ত নহে। দ্বিতীয়ত, জ্ঞানের বিষয়কে বিষয় বলিয়া জানিতে হইলে তাহার বিশিষ্টতাকে অতিক্রম করিয়া তাহার সার্ব্বিক স্বভাবের উপলব্ধি আবশ্যক। ইন্দ্রিয় তাহা করিতে পারে না, তাই ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুর মধ্যে বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াতীত প্রকৃতির সন্ধান না পাইলে আমাদের অভিজ্ঞতার কোন সম্ভাবনাই থাকিত না।

প্লেটোর দর্শনেও এ সমস্যা প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু তিনি যে তাহার কোন সমাধান করিতে পারিয়াছেন, তাহা মনে হয় না। তাঁহার পূর্ব্বে কেহ দেখিয়াছেন অনিবার পরিবর্ত্তনের চাঞ্চল্য, কেহ দেখিয়াছেন নির্ব্বিকার প্রকৃতির অটুট স্থৈর্য্য। প্লেটোর কৃতিত্ব এই যে তিনি পরিবর্ত্তন এবং স্থায়িত্ব, এই দুইয়েরই প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া তাহাদের সম্বন্ধের বিবরণ দিতে চাহিয়াছেন, বলিয়াছেন যে অভিজ্ঞতায় তাহারা যুক্ত, এবং এই সংযোগের ফলেই অভিজ্ঞতার উদ্ভব। এ সংযোগ কিন্তু প্লেটোর কাছে অবোধগম্য, এমন কি তাহা অনুসঙ্গ না ঐক্য, সে সম্বন্ধেও তাঁহার মতামত সুনির্দ্দিষ্ট নহে। এক পক্ষে বুদ্ধি আমাদের কাছে ইন্দ্রিয়াতীত, নিত্য, সার্ব্বিক রূপ-সমূহকে প্রকাশ করে, বুদ্ধির এ অভিজ্ঞতার নাম জ্ঞান। অন্যপক্ষে ইন্দ্রিয় আমাদের কাছে অনিত্য এবং বিশিষ্ট বস্তুবৈচিত্র্যপরিপূর্ণ পৃথিবীকে প্রকাশ করে, এক্ষেত্রে আমাদের যে অভিজ্ঞতা, তাহাকে জ্ঞান বলা চলে না; সে কেবলমাত্র অভিমত। জীবনের প্রয়োজনে তাহাদের সার্থকতা আছে, কিন্তু জ্ঞানের ন্যায়সঙ্গতির মধ্যে তাহাদের

স্থান নাই। অথচ পৃথিবীর বস্তুসমূহ এই সমস্ত নিত্য ও সার্ব্বিক রূপসমূহের প্রতিকৃতি বা প্রতিবিম্ব। রূপের সঙ্গে বস্তুর সম্বন্ধ যে কি, সে সম্বন্ধে প্লেটোর মতবৈচিত্র্য দেখিয়াই বোঝা যায় যে এ সমস্যার প্লেটো কোন সমাধান করিতে পারেন নাই, তাই কখনো তিনি বলিয়াছেন যে বস্তু রূপের প্রতিবিম্ব, কখনো বলিয়াছেন যে তাহাদের সম্বন্ধ কার্য্য-কারণের সম্বন্ধ, কখনো বা বলিয়াছেন বস্তু রূপের প্রকৃতির অংশীদার।

প্লেটো এ সমস্যার কোন সমাধান করিতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার বিবরণে যে দুইটি দিক ছিল, ইয়োরোপের পরবর্ত্তী দর্শনের ইতিহাস সেই দুই ধারার দ্বন্দ্বের ইতিহাস। ইন্দ্রিয়াতীত যে নিত্যরূপের পরিকল্পনা প্লেটো করিয়াছিলেন, তাহাকে অবলম্বন করিয়া দার্শনিকের পর দার্শনিক সৃষ্টির বুদ্ধিগত বিবরণ দিতে চাহিয়াছেন, বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয় যে জগতের পরিচয় দেয়, তাহার ব্যবহারিক সত্তা থাকিলেও তাহার মধ্যে পারমাথিক সত্য নাই। সেই জগতের সঙ্গে যে পরিচয়, সে পরিচয়ও তাই কেবলমাত্র অভিমত, আমাদের জ্ঞানের অপূর্ণতার সাক্ষ্য মাত্র। মানবজ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দিনে দিনে তাহা রূপান্তরিত হইয়া সত্যের রূপ-উপলব্ধিতে পরিণত হইবে, জ্ঞানের সেই পূর্ণতার মধ্যে বিশেষের আর কোন বিশিষ্ট স্থান থাকিবে না। এক অনাদ্যন্ত স্বয়ংপ্রকাশ সত্যের বিভিন্ন রূপ বলিয়া জগৎপ্রপঞ্চকে আমরা জানিব, বুঝিব যে সৃষ্টিতে বিশিষ্টের যে বিচিত্র ঐশ্বর্য্য, তাহার মূলেও রহিয়াছে সেই রূপহীন নামহীন গুণহীন ব্রহ্ম।

প্লেটো বিশিষ্টের যে পরিচয়কে ইন্দ্রিয়গোচর বলিয়াছিলেন,

তাহাকে অবলম্বন করিয়া বিরুদ্ধমতের দার্শনিকেরা কিন্তু বলিয়াছেন যে নিত্যরূপের জ্ঞানসাধনা বুদ্ধির পক্ষে পণ্ডশ্রম, নির্গুণ ব্রহ্মের পরিকল্পনা পরিকল্পনার অভাবেরই নামান্তর। প্রতিমুহূর্ত্তের সংবেদনায় যে বিশিষ্ট বস্তু প্রকাশিত হয়, তাহাই একমাত্র সত্য, তাহাকে লক্ষ্য করাই বিজ্ঞানের পদ্ধতি, তাহার মধ্যে নিয়মের শৃঙ্খল আবিষ্কার করিয়াই বিজ্ঞানের অভিযান। সম্বন্ধ ও লক্ষণ দিয়াই বস্তুর বৈশিষ্ট্য, কিন্তু সেই বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করিবার সাধনায় সম্বন্ধ ও লক্ষণকে অতিক্রম করিয়া বস্তুর পারমার্থিক সত্তা খুঁজিলে পারমার্থিক অথবা ব্যবহারিক কোন সত্তারই সন্ধান মিলিবে না, বুদ্ধির এ দুঃসাহসের ফলে শূন্যতার সীমাশূন্য গহ্বরে অনুসন্ধিৎসার অনন্ত সমাধি অবশ্যম্ভাবী।

বুদ্ধিবাদীর দর্শনে তাই সংযোজনা বা সংশ্লেষণের স্থান নাই, তাঁহার চক্ষে জ্ঞানের প্রগতি বিশ্লেষণে। অভিজ্ঞতা নিরীক্ষা ও পরীক্ষার দ্বারা আমাদের কাছে যে অনুসঙ্গ প্রকাশিত করে, তাহা কেবলমাত্র আমাদের সীমাবদ্ধ বুদ্ধির অক্ষমতার পরিচায়ক। দর্শনের পূর্ণতায় এই বিশিষ্ট জ্ঞানের স্থান নাই, একটি মাত্র স্বতঃসিদ্ধ সার্ব্বিক সূত্র হইতে বিশ্বের সমস্ত বৈচিত্র্যকে নিষ্কাষিত করিতে পারিলেই দর্শনের সাধনা সফল। তাই এই বৌদ্ধিক দর্শনে স্থানকালগত পার্থক্য লক্ষণীয় নহে, স্থান ও কাল কেবলমাত্র অস্পষ্ট ধারণা বলিয়া বুদ্ধির বিজয় অভিযানে তাহাদের অস্পষ্টতা এবং দুর্ব্বোধ্যতা দূর হইয়া কালক্রমে তাহারা সেই স্বতঃসিদ্ধ সার্ব্বিক সূত্রের অঙ্গীভূত ধারণারূপে প্রতিভাত হইবে। এক কথায়, এই বৌদ্ধিক দর্শনের ফলে সার্ব্বভৌমিকতার সাধনায় সমস্ত

বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হইয়া যাইতে বাধ্য। বিজ্ঞানে অনুভূতির যে অবদান, তাহা মানব ক্ষমতার অপূর্ণতাপ্রসূত বলিয়া কালক্রমে তাহার বিলয় অবশ্যম্ভাবী। কার্টেসিয়ান দর্শনেও এই পরিকল্পনার আভাস মেলে। সংবেদনা বিশিষ্ট এবং স্থানকালনির্দ্দিষ্ট বলিয়া বিজ্ঞানের সার্ব্বিক জ্ঞানে বস্তুবিশেষের স্থানসংকুলান দুঃসাধ্য ব্যাপার, ক্ষণিকবাদ বা occasion-alism-এর পারলৌকিক রহস্যের মধ্য দিয়া তাই আমাদের জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তের সংবেদনাকে জ্ঞানগোচর করিয়া তুলিবার প্রয়াস। লাইবনিট্জের দর্শনে এই সমস্যা স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে জ্ঞানের পূর্ণতায় সংযোজনার স্থান নাই, ঈশ্বরের কাছে তাই বিশ্বজগতের সমস্ত বস্তু ও ঘটনাই ন্যায়ের সঙ্গতিসূত্রে বদ্ধ। বিশ্লেষণই সেখানে সত্যের পরিচায়ক, তাই নিরীক্ষা বা পরীক্ষা কেবলমাত্র আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয়, পূর্ণজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাহারা প্রযোজ্য নহে।

বৈজ্ঞানিক কিন্তু একথা স্বীকার করিতে চাহেন নাই, বলিয়াছেন যে কেবলমাত্র বিশ্লেষণে আমাদের ধারণার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিভেদ প্রকাশিত হইতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞানের জয়যাত্রার বিবরণ তাহাতে মেলে না। বিজ্ঞানে সার্ব্বিক সূত্রের প্রাধান্য যতই থাকুক না কেন, বিশিষ্টের প্রতি নির্দ্দেশও সেখানে অবশ্যম্ভাবী। ভবিষ্যদ্বাণী বিজ্ঞানের সাফল্যের একটি প্রধান লক্ষণ, এবং সার্ব্বিক সূত্রের উপর তাহা যতই নির্ভর করুক না কেন, তাহার প্রয়োগ বিশেষের ক্ষেত্রে। এই বিশেষকে বর্জ্জন করিলে বিজ্ঞানের বিজয় অভিযানের অনেকখানিই বর্জ্জন করিতে হয়।

অভিজ্ঞতাবাদীরা তাই বিজ্ঞানের পক্ষ হইতে প্রশ্ন করিলেন যে বিশ্লেষণই যদি জ্ঞানের বাহন হয়, তবে বিশ্লেষণ করিবার বিষয় আসিল কোথা হইতে? বিশ্লেষণের ফলে তো আর বিশ্লেষণের বিষয়ের উদ্ভব হইতে পারে না, কাজেই বুদ্ধির গবেষণাকে আমরা যত দূরই প্রসারিত করি না কেন, অবশেষে এমন একটি স্থলে পৌঁছিতে আমরা বাধ্য যেখানে বুদ্ধি দ্রষ্টা মাত্র, স্রষ্টা নহে। কাজেই অভিজ্ঞতার রূপ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যাহাই হউক না কেন, অভিজ্ঞতাজাত জ্ঞানের বিষয়কে আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে।

বস্তুতঃ তাহাই হইয়াছে। বুদ্ধিবাদীরাও বাধ্য হইয়া স্বীকার করিয়াছেন যে কোন একটি স্বতঃসিদ্ধ সার্ব্বিক সূত্রের বিশ্লেষণেই জ্ঞানের বিকাশ। সেই সার্ব্বিক সূত্রটি কিন্তু আমাদের সৃষ্ট বা কল্পনাপ্রসূত নহে, আমাদের পক্ষে তাহা দত্ত এবং সেই হিসাবে তাহা আমাদের অভিজ্ঞতার সামগ্রী। বুদ্ধিবাদীরা বিশ্বব্যাপারের বৈচিত্র্যের বিবরণ দিতে গিয়াও তাই পদে পদে মুস্কিলে পড়িয়াছেন। যদি কেবলমাত্র স্বতঃসিদ্ধটিই দত্ত হয়, তবে সে স্বতঃসিদ্ধের ঐক্যের মধ্যে সৃষ্টির বৈচিত্র্যের অবকাশ কোথায়? এই বৈচিত্র্য যদি মানব-মন-প্রসূত হয়, তবে সেই কারণেই তাহা বিশ্বব্যাপারের প্রকৃত সত্য নহে। অন্যথায় তাহা স্বতঃসিদ্ধের মধ্যেই নিহিত ছিল, এবং ফলে স্বতঃসিদ্ধের ঐক্য কেবলমাত্র আপাতদৃষ্ট, বস্তুতঃ পৃথিবীর বৈচিত্র্য অভিজ্ঞতার ফলেই আমরা জানি। অভিজ্ঞতাবাদী তাই বলেন যে জ্ঞান অভিজ্ঞতার ফল। অভিজ্ঞতায় আমরা স্থান-কাল-নির্দ্দিষ্ট বিশেষকেই জানি, এবং বিশেষের সঙ্গে বিশেষের সাদৃশ্য

লক্ষ্য করিয়া তাহাদের স্বভাব জানিতে চেষ্টা করি। এই সাদৃশ্য লক্ষ্যও অভিজ্ঞতার অঙ্গ, তাই আমরা যাহাকে সার্ব্বিক জ্ঞান বলি, তাহা প্রকৃতপক্ষে সাধারণ জ্ঞান। তাহাও অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত, এবং অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত বলিয়া তাহার মধ্যে অনিবার্য্যতার কোন চিহ্ন নাই। বিজ্ঞানের সার্ব্বভৌমিক সত্যও তাই প্রকৃতপক্ষে সার্ব্বভৌমিক বা নিত্য নহে, আমাদের অভিজ্ঞতায় তাহাদের প্রকাশে কোন ব্যতিক্রম দেখি নাই বলিয়াই আমরা তাহাদের সার্ব্বিক সত্য বলিয়া মনে করি। যদি কোন দিন কোন ব্যতিক্রমের পরিচয় পাই, তবে বিজ্ঞানের সূত্রও সেই সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে।

এক হিসাবে এ বিবরণ যে বিজ্ঞানের প্রকৃত বিবরণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। নিত্য নূতন আবিষ্কারের ফলে আমাদের জ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের সূত্রও পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। স্থান-কাল-নিরপেক্ষ নিত্য সত্যের স্থান বিজ্ঞানে নাই। কিন্তু একথাও সত্য যে এ বিবরণে বিজ্ঞানের মর্ম্মকথা বাদ পড়িয়া যায়। বিজ্ঞানের কোন সূত্রকেই আমরা নিত্য সত্য বলিয়া না মানিতে পারি, কালে বিজ্ঞানের সূত্রের পরিবর্ত্তন হয়, তাহাও সত্য, কিন্তু তবু বিজ্ঞান নিত্যতার যে দাবী করে, তাহাকেও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যদি অভিজ্ঞতা কেবলমাত্র বিশেষেরই অভিজ্ঞতা হইত এবং বিজ্ঞানের সূত্র কেবলমাত্র বিশিষ্ট অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত সমষ্টি বা সাঙ্কেতিক প্রতিভাসমাত্র হইত, তবে বিজ্ঞানের বিচারে সত্য মিথ্যার প্রশ্নই উঠিত না। বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বলা চলে যে তাহা তথ্য, তাহা ঘটে

অথবা ঘটে না—কিন্তু তাহার বেলা সত্যাসত্যের কোন প্রশ্নই উঠে না। তাহাদের সমষ্টিও তথ্যের সমষ্টি, তাহাদের বেলায়ও সত্যাসত্যের প্রশ্ন তাই ঠিক সমান ভাবে অপ্রযোজ্য। কিন্তু বিজ্ঞানের সূত্র সত্য বলিয়া দাবী করে এবং সার্ব্বিকতা ও নিত্যতা না থাকিলে এ দাবীর কোন অর্থ-ই হয় না। নূতন তথ্যকে বুঝাইতে সূত্রের যে পরিবর্ত্তন, সেই পরিবর্ত্তনেই প্রমাণ হয় যে সূত্র কেবলমাত্র সাধারণ নহে, সার্ব্বিকও বটে। তাহা না হইলে সূত্রকে পরিবর্ত্তন করিবার কোন প্রয়োজন থাকিত না, বলিলেই হইত যে এতদিন আমরা অভিজ্ঞতায় এক রকম পাইয়াছি, এখন অন্য রকম পাইলাম। তাহা বলিলে কিন্তু বিজ্ঞানের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা হয়, কারণ তথ্যের সঙ্গে তথ্যের সম্বন্ধকে একত্রিত করার নাম বিজ্ঞান নয়, বিজ্ঞানের লক্ষ্য তথ্যের সঙ্গে তথ্যের সম্বন্ধকে বোধগম্য করা। যে ভবিষ্যদ্বাণী বিজ্ঞানের সাফল্যের একটি প্রধান লক্ষণ, বিজ্ঞানের সার্ব্বিকতায় বিশ্বাস না করিলে তাহার সম্ভাবনার কল্পনাও অর্থহীন হইয়া দাঁড়ায়।

ফলে বুদ্ধিবাদী এবং অভিজ্ঞতাবাদী, কেহই মানুষের জ্ঞান যে কি করিয়া সম্ভবপর, তাহার কোন বিবরণ দিতে পারেন না। মানুষের জ্ঞান ব্যক্তিকেন্দ্রিক, ব্যক্তিত্বের সীমানাকে লঙ্ঘন করিয়া তাহা যে কেমন করিয়া সার্ব্বিক সূত্রে উপনীত হয়, বুদ্ধিবাদ এবং অভিজ্ঞতাবাদ উভয়ের কাছে তাহা সমানভাবেই রহস্য। বুদ্ধিবাদ জ্ঞানের সার্ব্বিকতার বিবরণ দিতে গিয়া তাহাকে কেবলমাত্র শাব্দিক করিয়া তোলে, কিন্তু যে নূতনত্ব জ্ঞানের অপরিহার্য্য অঙ্গ, তাহার কোন বিবরণ তাহাতে মিলে না। বুদ্ধিবাদের কাছে জ্ঞানের চরম সূত্র স্বতঃসিদ্ধ

এবং স্বতঃসিদ্ধের বিশ্লেষণের ফলে জ্ঞানের বিকাশ বলিয়া জ্ঞান সার্ব্বিক এবং স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু সে সার্ব্বভৌমিকতার মধ্যে বিশেষের কোন স্থান নাই। বিশেষ যে কেমন করিয়া সামান্যেরই বিশেষ এবং সেই কারণে সার্ব্বিক সূত্রকে প্রকাশ করাই তাহার স্বভাব, বুদ্ধিবাদ তাহার বিষয়ে কিছুই বলিতে পারে না, এমন কি আমরা যে কেমন করিয়া বিশেষের কল্পনা করিতে পারি, সে কথাও অবোধগম্য থাকিয়া যায়। অভিজ্ঞতাবাদ বিশেষের জ্ঞানকেই কেন্দ্র করিয়া তোলে, কিন্তু সে বিশেষের মধ্যে সার্ব্বিকতা বা স্বতঃসিদ্ধতার কোন লক্ষণ নাই, তাই বিশেষকে অতিক্রম করিয়া আমাদের অভিজ্ঞতার যে রূপ, অভিজ্ঞতাবাদের কাছেও তাহা সমানভাবেই রহস্য।

চার

কাণ্ট বুদ্ধিবাদ এবং অভিজ্ঞতাবাদ, দুইয়েরই এ ব্যর্থতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার দর্শনের প্রথম প্রশ্ন—সংযোজক সার্ব্বভৌম বাক্য কি করিয়া সম্ভবপর? বুদ্ধিবাদের মতে সমস্ত বাক্যই সার্ব্বভৌম, কিন্তু তাহারা সংযোজক নহে, বিশ্লেষণলব্ধ বলিয়া শাব্দিক। অন্যপক্ষে অভিজ্ঞতাবাদের মতে সমস্ত বাক্যই সংযোজক, কিন্তু বিশেষের সঙ্গে বিশেষের সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া তাহারা সার্ব্বভৌম নহে, বাস্তব হইয়াও তাহাদের সম্বন্ধ অনিবার্য্য নহে।

কাণ্টপূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিকদের মধ্যে হিউম সে কথা বুঝিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন যে, কার্য্য-কারণ-বিধি বিশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইয়াও অনিবার্য্যতার দাবী করে। অভিজ্ঞতাবাদ সে দাবীকে স্বীকার করিতে পারে না, বলে যে এ দাবী বুদ্ধিগত নহে, আবেগের উপর তাহার প্রতিষ্ঠা। ফলে জ্ঞান আর বোধগম্য থাকে না, কেবলমাত্র আবেগের প্রতিক্রিয়া হইয়া দাঁড়ায়। আবেগ ব্যক্তিগত, কাজেই একজনের আবেগের সঙ্গে অন্যের আবেগের কোন অসঙ্গতি নাই, সংঘর্ষ বাধিলেও আবেগগুলির মতন সে সংঘর্ষও সমানভাবেই তথ্য মাত্র। তাহা হইলে তাহার স্বীকৃতি অস্বীকৃতির কোন কথাই ওঠে না, তাহাকে জ্ঞান বলাও ভাষার প্রতি অত্যাচার ভিন্ন আর কিছুই নহে।

কাণ্ট হিউমের প্রশ্ন ও আলোচনাকে স্বীকার করিয়াও তাঁহার মীমাংসাকে অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি দেখিলেন যে,

সংযোজক সার্ব্বভৌম বাক্য কেবলমাত্র কার্য্য-কারণ-বিধিকেই প্রকাশ করে না, অভিজ্ঞতার সমস্ত ক্ষেত্রেই এই প্রকারের বাক্যের প্রসার। জ্ঞানকে সাধারণ ভাবে অস্বীকার করা স্ববিরোধী, কারণ সেই অস্বীকারই সে সমস্ত ক্ষেত্রে জ্ঞান হইয়া দাঁড়ায়। কাজেই কোন বিশেষ জ্ঞানকেই অস্বীকার করা চলে এবং তাহার জন্যও অন্য বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন। প্রতি ক্ষেত্রেই আমাদের জ্ঞান অভিজ্ঞতায় সঞ্জাত হইলেও অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করিয়া যায়, তাই একপক্ষে অভিজ্ঞতা-জাত বলিয়া তাহা যেমন সংযোজক, তেমনি অন্যপক্ষে অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করে বলিয়া তাহা সার্ব্বিক। গণিত ও পদার্থবিদ্যা লইয়া কাণ্ট বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু সংযোজক সার্ব্বভৌম বাক্যের প্রয়োগ কোন বিশিষ্ট ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নহে, অভিজ্ঞতার সঙ্গেই তাহা সমপ্রসার।

সংযোজক সার্ব্বভৌম বাক্যের অস্তিত্বে সন্দেহও তাই অন্যায়, প্রতিমুহূর্ত্তের অভিজ্ঞতায়ই এই প্রকারের বাক্য প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু বুদ্ধিবাদে বা অভিজ্ঞতাবাদে এই প্রকারের বাক্যের সম্ভাবনা নাই, সুতরাং আমাদের অভিজ্ঞতার বিবরণ হিসাবে দুই মতবাদকেই বাতিল না করিয়া উপায় নাই। বস্তুতঃ বুদ্ধিবাদ এবং অভিজ্ঞতাবাদ একই কারণে আমাদের কাছে অগ্রাহ্য। তাহাদের উভয়ের পক্ষেই জ্ঞান প্রধানতঃ বিশ্লেষণের ফল, কেবলমাত্র জ্ঞানের বিষয়বস্তু লইয়া তাহাদের মধ্যে প্রভেদ। বুদ্ধিবাদের মতে একটি সর্ব্বব্যাপী স্বতঃসিদ্ধ আমরা সাক্ষাৎভাবে জানি, সমস্ত জ্ঞান সেই স্বতঃসিদ্ধেরই ক্রমশীল বিশ্লেষণ। অভিজ্ঞতাবাদের মতে ইন্দ্রিয় যে লক্ষণমণ্ডলী প্রকাশ করে, জ্ঞান কেবলমাত্র সেই

সংবেদনা-জগতের বিশ্লেষণ। বিশ্লেষণের বিষয়বস্তু বিভিন্ন হইলেও জ্ঞানের পদ্ধতি দুই ক্ষেত্রেই এক। দুই ক্ষেত্রেই মানুষের বুদ্ধি নিশ্চেষ্ট ভাবে বিষয়বস্তুকে গ্রহণ করে, ব্যক্তির চিত্তে জ্ঞান তাই দুই ক্ষেত্রেই ফলস্বরূপ, সক্রিয় চিত্তের সৃষ্টিপদ্ধতি নহে। বিশ্লেষণকে ক্রিয়া মনে করিলে দুই ক্ষেত্রেই বুদ্ধিকে ক্রিয়াশীল মনে করা যায়, কিন্তু বিষয়বস্তুর উপরে সমস্ত ঝোঁক পড়ায় কোন ক্ষেত্রেই তাহা হয় নাই।

বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়কে পৃথক করিয়া দেখিলে এ রকম সিদ্ধান্ত অবশ্যম্ভাবী। জ্ঞানের বস্তুকে যদি আমরা বুদ্ধিলব্ধ মনে করি, তবে বোধগম্যতাকেই আমরা তাহার সত্তার প্রমাণ বলিয়া মনে করিতে বাধ্য। ফলে যাহা বোধগম্য, তাহাই সত্য, এবং তাহা হইলে ভ্রান্তির কোন বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। অন্যথায় জ্ঞানের বিষয়বস্তুকে ইন্দ্রিয়জ মনে করিলে তাহার ইন্দ্রিয়গম্যতা দিয়াই আমরা তাহার সত্য প্রমাণ করিতে চাহি, এবং তাহা হইলেও ভ্রান্তির কোন সম্ভাবনা থাকে না। এক কথায় জ্ঞানের বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যদি আমরা এমন কোন লক্ষণ খুঁজি, যাহার ফলে সত্য ও মিথ্যা দৃষ্টিমাত্রেই স্বকীয় মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইবে, তবে আমাদের চেষ্টা নিষ্ফল হইতে বাধ্য। কোন ক্ষেত্রেই কোন বিশেষ জ্ঞানই কেবলমাত্র আপনার অধিকারে সত্য নহে,—কেবলমাত্র স্বাধিকারে তাহাকে সত্য মনে করিলে দর্শন পরাবিদ্যাতে পরিণত হয়। তখন বিশেষ জ্ঞানের সঙ্গে বিশেষ জ্ঞানের সম্বন্ধের কথা ভুলিয়া আমরা জানিতে চাহি—কোন স্বয়ং-প্রকাশ লক্ষণের গুণে সত্য আপনাকে সত্য বলিয়া প্রকাশ করে। দর্শন তখন সত্তার লক্ষণবিচারে প্রবৃত্ত হয়, বস্তু এবং আত্মার

পারমার্থিক সত্য, তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ ও তাহার সম্ভাবনাই তখন দর্শনের লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়।

কাণ্ট বুঝিয়াছিলেন যে, এ পথে দর্শনের সাফল্যের কোনই আশা নাই। সত্যের যদি স্বপ্রকাশ লক্ষণ থাকিত, তবে একবার যাহাকে সত্য বলিয়া জানা যায়, তাহা চিরদিনের মতনই সত্য থাকিতে বাধ্য। ভুল করিয়া মানুষ শেখে, মানুষের বুদ্ধির সাধনা অতীতের সহস্র ভ্রান্তিকে সত্যে রূপান্তরিত করে, বিজ্ঞানের প্রগতিতে নূতন নূতন তথ্য নিয়মের সূত্রে গ্রথিত হয়। তাই জ্ঞানের বিষয়বস্তুর লক্ষণ কি, সে প্রশ্ন না তুলিয়া কাণ্ট জিজ্ঞাসা করিলেন—জ্ঞানের প্রগতিকে সম্ভবপর করিতে হইলে অভিজ্ঞতাকে কেমন করিয়া বুঝিতে হইবে? বিশেষ জ্ঞানের সঙ্গে বিশেষ জ্ঞানের যে সঙ্গতি, সে সঙ্গতিকে বুঝিবারই বা উপায় কি? সংযোজক সার্ব্বভৌম বাক্যের সম্ভাবনায় কাণ্ট এ প্রশ্নের উত্তর পাইয়াছিলেন, কারণ এই প্রকারের বাক্য প্রত্যক্ষকে অতিক্রম করে বলিয়া তাহার সত্য কেবলমাত্র বিষয়বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া জানিবার উপায় নাই। বর্ত্তমান অভিজ্ঞতার সঙ্গে অতীত অভিজ্ঞতার সামঞ্জস্য যদি তাহাতে সাধিত হয়, ভবিষ্যতের অভিজ্ঞতার সম্ভাবনাকে যদি তাহা বিনষ্ট না করে, তবেই তাহাকে আমরা সত্য বলিয়া জানি। জ্ঞানের যাহা বিষয়, তাহাকে যদি বাস্তব এবং ভ্রান্তির বিষয়কে যদি অবাস্তব নাম দেওয়া যায়, তবে বলিতে হয় যে, পুরাতন দর্শনে বাস্তব এবং অবাস্তবের প্রভেদ ছিল প্রকৃতিগত। কিন্তু কাণ্টের মতে তাহাদের প্রকৃতিগত পার্থক্য যে কেবলমাত্র অজ্ঞেয় তাহা নহে, বাস্তব এবং অবাস্তবের যথার্থ পার্থক্যকে তাহা প্রকাশই করে না। তাঁহার মতে

বাস্তব এবং অবাস্তবের প্রভেদ সম্বন্ধে। বিভিন্ন সম্বন্ধের যেখানে সঙ্গতি, তাহাকেই আমরা বলি বাস্তব এবং সম্বন্ধের অসঙ্গতি ঘটিলে তাহাকেই অবাস্তব বলি। জাগ্রত জীবনের অভিজ্ঞতায় বিভিন্ন সম্বন্ধের সঙ্গতি রক্ষা হয় বলিয়াই তাহা বাস্তব, স্বপ্নে তাহার অভাবের দরুণই স্বপ্ন অবাস্তব।

বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়কে পৃথক করিয়া দেখিলে সংযোজক সার্ব্বভৌম বাক্যের কোন বিবরণ দেওয়া তাই অসম্ভব। প্রতিমুহূর্ত্তের অভিজ্ঞতায়ই এই প্রকারের বাক্য প্রকাশিত হইতেছে বলিয়া অভিজ্ঞতার বিবরণ হিসাবে বুদ্ধিবাদ এবং অভিজ্ঞতাবাদ উভয়েই অগ্রাহ্য। ঠিক একই কারণে বিজ্ঞানের পদ্ধতি এবং তাহার তাৎপর্য্যের আলোচনায় বুদ্ধিবাদ এবং অভিজ্ঞতাবাদ উভয়েরই নিষ্ফলতা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তাই এই সমস্যার সমাধানেই কাণ্ট তাঁহার দর্শনের মর্ম্মকথা খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। সে সমাধানের মূলকথা এই যে বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়কে স্বতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করিলেও জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাহাদের সংযোগকে অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই। ইন্দ্রিয়গম্য ও বুদ্ধিলব্ধ বিষয় যে বিভিন্ন নহে, সে বিষয়ে কাণ্টের কোন সন্দেহ নাই। তাহাদিগকে পৃথক করিয়া দেখিবার ফলেই কাণ্ট-পূর্ব্ব দর্শন চালমাৎ হইবার উপক্রম হইয়াছিল, ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির বিষয়ের ঐক্য নির্দ্দেশ করিয়া কাণ্ট দর্শনকে সে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয়কে যদি আমরা স্বতন্ত্র মনে করি, তবে অভিজ্ঞতায় তাহাদের সংযোগের কোন বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। পক্ষান্তরে অভিজ্ঞতায় তাহাদের সংযোগকে স্বীকার করিয়া লইয়া যদি আমরা তাহার বিশ্লেষণ করিতে চাহি,

তবে অভিজ্ঞতার সার্ব্বিকতা এবং বৈশিষ্ট্য বুঝিবার পথে কোন বাধা থাকে না। ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির বিষয়ের ঐক্য স্বীকারের ফলে কাণ্ট দেখিলেন যে প্রত্যয় এবং সংবেদনার মধ্যে প্রভেদ থাকিলেও তাহারা পৃথক নহে, সংবেদনা না থাকিলে প্রত্যয় অর্থহীন, প্রত্যয় না থাকিলে সংবেদনা অজ্ঞেয়।

এখানে আপত্তি উঠিতে পারে যে প্রত্যয় বস্তু অথবা ঘটনার স্বভাবকে প্রকাশ করে বলিয়া তাহা সার্ব্বিক, সার্ব্বিক বলিয়া দেশ-কালের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই, তাই তাহার অস্তিত্বেরও কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না। পক্ষান্তরে সংবেদনা বিশিষ্ট, বিশেষ দেশ-কালজ বলিয়া বিশিষ্ট অস্তিত্বের মধ্যে তাহা সীমাবদ্ধ। বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয়কে এক মনে করিলে প্রত্যয়কে সংবেদনার মধ্যে আবদ্ধ মনে করিতে হয়; কিন্তু তাহা হইলে প্রত্যয়ের সার্ব্বিকতাকে স্বীকার করিবার অর্থ কি? এ আপত্তির উত্তরে কাণ্টের বক্তব্য এই যে বিভিন্ন সংবেদনার অস্তিত্বগত পার্থক্যকে অবহেলা করিয়া তাহাদের মধ্যে প্রকৃতিগত ঐক্য স্থাপনই প্রত্যয়ের কাজ, তাই ইন্দ্রিয়জ বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াই বুদ্ধির বিকাশ। ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় বুদ্ধির পক্ষেও সমানই অলভ্য। ন্যায়ের ভাষায় বলিতে হয়, বিশেষ ও সামান্যকে পৃথক জ্ঞান করিলেও বিশেষ ব্যতীত সামান্যের অথবা সামান্য ব্যতীত বিশেষের জ্ঞান সমানই অসম্ভব।

কাণ্টের বক্তব্যকে ঘুরাইয়া বলা চলে যে প্রত্যয়ের ধর্ম্ম সংবেদনার মধ্যে সম্বন্ধস্থাপন করিয়া তাহাদের শ্রেণীবিভাগ। সেইজন্যই প্রত্যয় এবং সংবেদনার বিষয় এক, অথচ প্রত্যয় এবং সংবেদনা বিভিন্ন। ফলে প্রত্যয়কে সংবেদনার সঙ্গে

সমশ্রেণীয় মনে না করিয়া অভিজ্ঞতার সামঞ্জস্য সাধনের মননরীতি মনে করাই সঙ্গত। বিভিন্ন প্রত্যয়ের বিষয়ে যাহা সত্য, মানবচিত্তের মননরীতির বেলায় সাধারণ-ভাবে তাহা আরো বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ফলে এই সমস্ত মননরীতির সম্বন্ধ সাক্ষাৎ-ভাবে সংবেদনার বিষয়বস্তুর সঙ্গে নহে, অভিজ্ঞতার যে সংগঠনের উপর তাহাদের সম্ভাব্যতা ও বোধগম্যতা নির্ভর করে, তাহাদের সঙ্গেই আমাদের মননরীতির কারবার। মননরীতির সম্বন্ধে যাহা আমরা বলি, তাহা অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তুর বর্ণনা নহে, অভিজ্ঞতার সম্ভাবনারই তাহা বর্ণনা। সমস্ত সংবেদনা ও চিন্তাধারার মূলে যে সমস্ত সাধারণ সূত্র, অভিজ্ঞতার সম্ভাব্যতা দিয়াই তাহাদের সত্য প্রমাণিত হয়, কিন্তু ঠিক সেই কারণেই তাহারা অভিজ্ঞতার সীমানার মধ্যেই আবদ্ধ।

বিজ্ঞান কি করিয়া সম্ভব তাহার বিবরণও এইখানেই মেলে। বিশেষের পরীক্ষা ও নিরীক্ষার ফলে তাহার স্বভাব সম্বন্ধে সার্ব্বিক সূত্র-আবিষ্কারই বিজ্ঞানের ধর্ম্ম, তাই ভবিষ্যদ্বাণীতেই বিজ্ঞানের সাফল্যের পরিচয়। ভবিষ্যদ্বাণীর অর্থ প্রকৃতিকে আদেশ-দান, বিশেষ বস্তুর অভিজ্ঞতার পূর্ব্বেই তাহার স্বভাব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ। আমরা তাহার সম্বন্ধে যাহা ভাবিতেছি, বস্তুতও তাহা সেই স্বভাবের পরিচয় দিবে, এই ভরসাই সেই পূর্ব্বজ্ঞানের ভিত্তি। এই ভরসাকে কেবল-মাত্র আবেগের দাবী বলিয়া গণনা করা যায় না, কারণ তাহা হইলে বিজ্ঞান এবং সমস্ত অভিজ্ঞতাই আবেগের প্রতিক্রিয়া হইয়া দাঁড়ায়। অভিজ্ঞতাকে সাধারণ ভাবে অস্বীকার করা

স্ববিরোধী, তাই অভিজ্ঞতাকে স্বীকার করিয়া লইয়াই সমস্ত সন্দেহের সুরু। সেই অভিজ্ঞতার সার্ব্বিক সর্ত্তের উপরেই কাণ্ট বিজ্ঞানের সম্ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, বলিয়াছেন, যে সমস্ত সার্ব্বিক সূত্র অভিজ্ঞতার সম্ভাবনার সঙ্গেই জড়িত, অভিজ্ঞতার সম্ভাবনাই তাহাদের সত্যকে প্রমাণ করে। কাজেই যে ভরসা এই সমস্ত সার্ব্বিক সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা কেবলমাত্র ভরসা নহে, তাহাকে জ্ঞানের পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে।

মানুষের অভিজ্ঞতায় ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির প্রভেদ অথচ সংযোগের প্রয়োজনীয়তা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। চিত্তের যে মননরীতি অভিজ্ঞতার সম্ভাবনার ভিত্তি, তাহাকে সার্ব্বিক সূত্রে প্রকাশ করিতে গিয়া কাণ্ট তাই ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির কর্ম্মপদ্ধতির খানিকটা প্রভেদ স্বীকার করিয়াছেন। কাণ্টপূর্ব্ব দর্শনের মতে কেবলমাত্র তাহাদের কর্ম্মপদ্ধতিই যে বিভিন্ন, তাহা নহে, মননশক্তি হিসাবেও তাহারা সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বাধীন, এবং সেই জন্য তাহাদের জ্ঞাতব্য বিষয়ও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্লেটোর দর্শনেও আমরা এই মতবাদেরই পরিচয় পাই, কারণ তাঁহার মতে ইন্দ্রিয়লব্ধ বিষয় জ্ঞানের সামগ্রী নহে, তাহা কেবলমাত্র অভিমত। জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা তাই একমাত্র বুদ্ধির মধ্যেই নিহিত। ব্রহ্ম এবং অ-ব্রহ্মের পার্থক্যের সঙ্গে বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়ের পার্থক্যের সমীকরণের চেষ্টা তাই ইয়োরোপীয় বুদ্ধিবাদের একটী প্রধান অঙ্গ। তাহাকে অস্বীকার করিয়া কাণ্ট বলিলেন যে বুদ্ধি ব্রহ্মকে জানিবার উপকরণ নহে, বুদ্ধি দিয়া আমরা কেবলমাত্র জ্ঞানের বিষয়বস্তুকে জানিতে পারি। ফলে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বুদ্ধির

পার্থক্য বিষয়গত অথবা স্বভাবগত নহে, কেবলমাত্র কর্ম্ম-পদ্ধতিতেই তাহাদের পার্থক্য এবং মানুষের জ্ঞানের পূর্ণতার ফলে হয়তো ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি একই মননশক্তির বিচিত্র বিকাশ বলিয়া প্রতিভাত হইবে।

ব্রহ্মের সঙ্গে জ্ঞানের বিষয়বস্তুর পার্থক্যই কাণ্টের বিজ্ঞানবাদের মূলমন্ত্র। প্রথম দৃষ্টিতে এ পার্থক্যকে অর্থহীন মনে হইতে পারে, কারণ আমরা সাধারণত মনে করি যে যাহা জ্ঞানের বিষয় তাহাই সত্য, ব্রহ্মই জ্ঞানের লক্ষ্য। বিশ্লেষণের ফলে কিন্তু এ সহজ বিশ্বাস টিকিতে পারে না, কারণ মরীচিকা, ভ্রান্তি, স্বপ্ন এবং অন্যান্য অভিজ্ঞতার ফলে কোনটী জ্ঞান এবং কোনটী নহে, সেই সম্বন্ধেই মনে সন্দেহ জাগে, এবং ব্রহ্মকে জ্ঞানের বিষয়বস্তু বলিয়া বর্ণনা করিবার আর কোন সার্থকতা থাকে না। সেই কথাকেই কাণ্ট ব্রহ্মের সঙ্গে জ্ঞানের বিষয়বস্তুর পার্থক্যের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। তাহার মতে ব্রহ্মের স্বপ্রকাশ কোন পরিচয় নাই, থাকিলেও আমরা সে সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারি না। আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে ব্রহ্মের যতটুকু প্রবেশ, সেইটুকুই বাস্তব। কেবলমাত্র সেই বাস্তবকেই আমরা জানিতে পারি, কিন্তু অন্যপক্ষে অভিজ্ঞতাকে অভ্রান্ত বলিয়া জানিবার কোন উপায় নাই, তাই অভিজ্ঞতার আভ্যন্তরীণ বাস্তবকেও নিঃসন্দেহভাবে সত্য বলিয়া জানিবার কোন স্বপ্রকাশ লক্ষণ মেলে না। অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ ব্রহ্ম তাই আমাদের কাছে অজ্ঞেয় এবং চিরকাল অজ্ঞেয় থাকিতে বাধ্য, —তাহার সম্বন্ধে কোন বিবরণ দিতে যাওয়া অর্থহীন। অভিজ্ঞতায় লব্ধ জ্ঞানের বিষয়বস্তু লইয়াই তাই আমাদের

কারবার, তাহাকে জানিয়া এবং তাহার মধ্যে সত্য মিথ্যার বিচার করিয়াই জ্ঞানের বিকাশ।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে অভিজ্ঞতার মধ্যে আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ, এবং অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ ব্রহ্ম আমাদের কাছে অজ্ঞেয়, একথা স্বীকার করিলে অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ ব্রহ্মের কল্পনাই বা আমাদের মনে কেমন করিয়া আসিল? অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ সত্ত্বাকে যদি ব্রহ্ম এবং জ্ঞানের বিষয়-বস্তুকে যদি প্রকৃতি বলা হয়, তবে বলিতে হয় যে প্রকৃতির সঙ্গেই আমাদের সমস্ত কারবার, তাহাকে জানিয়াই বুদ্ধি তৃপ্ত, কিন্তু তাহা হইলে ব্রহ্মের সঙ্গে প্রকৃতির পার্থক্য-জ্ঞান কি করিয়া সম্ভবপর হইল? কাণ্টের মতে সঙ্গতিই প্রকৃতির লক্ষণ, তাই অভিজ্ঞতা সুসংবদ্ধ হইতে বাধ্য এবং অভিজ্ঞতার এই সঙ্গতিই জ্ঞানের ভিত্তি। বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে সঙ্গতি রহিয়াছে বলিয়াই সংযোজক সার্ব্বভৌম বাক্য সম্ভব-পর, এবং সেই সম্ভাবনার উপর বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। সেই জন্যই আমাদের জ্ঞান অভিজ্ঞতার সীমানাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না, সাক্ষাৎ অথবা বর্ত্তমানকে অতিক্রম করিলেও অতীত এবং ভবিষ্যৎকে লঙ্ঘন করিবার তাহার কোন ক্ষমতা নাই। ঘটনার সঙ্গে সম্ভাবনার সম্বন্ধস্থাপন করাই তাই বুদ্ধির কাজ, কিন্তু অভিজ্ঞতার সঙ্গতি রক্ষা করিয়া তবেই বুদ্ধি সম্ভাবনার বিচার করিতে পারে। এ সমস্ত কথা স্বীকার করিয়া লইয়াও, অথবা এ সমস্ত স্বীকার করিবার ফলেই কিন্তু প্রশ্ন উঠে যে সঙ্গতির প্রতিমানই যখন জ্ঞানের একমাত্র মান-দণ্ড, তখন ব্রহ্মের নামোল্লোখেরও কাণ্টের কোন অধিকার নাই।

এ আপত্তি কাণ্টের নিজের মনেও উঠিয়াছিল, কিন্তু বিচার করিয়া তিনি দেখিলেন যে প্রথম দৃষ্টিতে যুক্তিযুক্ত মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহা ভিত্তিহীন। ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির পার্থক্য সত্ত্বেও সমস্ত অভিজ্ঞতায় তাহাদের সংযোগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেই এ প্রশ্নেরও মীমাংসা অবশ্যম্ভাবী। সমস্ত অভিজ্ঞতায়ই ইন্দ্রিয় ক্রিয়াশীল, ইন্দ্রিয়-মুক্ত অমিশ্র বুদ্ধির বিষয়বস্তু বলিয়া কিছুই নাই। অভিজ্ঞ-তাকে ভিত্তি করিয়াই জ্ঞানের বিকাশ, তাই সে বিকাশে ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতার সম্প্রসারণ হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে অতিক্রম করিবার কোন ইঙ্গিত তাহার মধ্যে নাই। অন্যপক্ষে ইন্দ্রিয় যে বিষয়বস্তু আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত করে, তাহা প্রকৃত হইলেও খণ্ডিত। একথা প্রমাণ করিবার জন্য কোন যুক্তির প্রয়োজন নাই, প্রতিদিনের অভিজ্ঞতাই তাহার সত্য প্রকাশ করে। ইন্দ্রিয়ের সংবেদনায় অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তুর বিশেষ দিক অথবা খণ্ডমাত্র আমরা জানি, তাহার অন্যান্য দিক অথবা উপাদান ইন্দ্রিয়লব্ধ নহে, বুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত কল্পনার ফলেই তাহারা জ্ঞানগোচর। এই সমস্ত অন্যান্য দিক অথবা উপাদানও কিন্তু ইন্দ্রিয়াতীত নহে, ইন্দ্রিয়াতীত হইলে তাহারা অভিজ্ঞতার বিষয় বলিয়াই গণ্য হইতে পারিত না। ঘরে বসিয়া যখন দেওয়ালের দিকে আমরা চাহি, তখন দেওয়ালের অপর দিক সংবেদিত হয় না সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া অন্য পিঠ নাই, একথা স্বপ্নেও আমাদের মনে হয় না। অন্য পক্ষে, দেওয়ালের বাহির দিকও সংবেদনারই বস্তু, আমাদের অবস্থানের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে তাহাও ইন্দ্রিয়জ বলিয়া প্রকাশিত হয়। দূরে যে পাহাড়ের চূড়া আমি এই মুহূর্ত্তে

দেখিতেছি, কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করিয়া তাহাকে পাহাড় বলিয়া জানিবার কোন উপায় নাই। ইন্দ্রিয় কেবলমাত্র আমার দৃষ্টিপথে বিশেষ আকারবিশিষ্ট বর্ণপুঞ্জকে সংবেদনা হিসাবে প্রকাশ করিতেছে। সে সংবেদনা যে প্রকৃতপক্ষে কোন বস্তুর অঙ্গীভূত অথবা উপাদান, সে বস্তু যে কেবলমাত্র দ্রষ্টব্য নহে, তাহা যে স্পর্শনীয়, দার্ঢ্যশীল এবং অন্যান্য বহু প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য গুণসম্পন্ন, ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করিয়া তাহা জানিবার কোন উপায় নাই।

সঙ্গতিই প্রকৃতির লক্ষণ, কিন্তু সঙ্গতিও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। তবুও ইন্দ্রিয়জ বিষয়ের মধ্যেই সঙ্গতির সম্ভাবনা সীমাবদ্ধ, তাই উপস্থিত দেশকালকে অতিক্রম করিয়া গেলেও সমস্ত দেশকালকে অতিক্রম করিবার কোন নির্দ্দেশ অভিজ্ঞতায় মেলে না। ব্রহ্ম এবং প্রকৃতির পার্থক্যে কাণ্ট এই কথাই প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। একপক্ষে সমস্ত অভিজ্ঞতার মূলেই ইন্দ্রিয়জ উপাদান, অন্যপক্ষে ইন্দ্রিয়জ বর্ত্তমানকে অতিক্রম না করিয়া গেলে অভিজ্ঞতার কোন অর্থই হয় না। এই অতিক্রমণ বুদ্ধির ধর্ম্ম, এবং কাণ্টপূর্ব্ব বহু দার্শনিকের মতে এই অতিক্রমণেই জ্ঞানের সম্ভাবনা। তাঁহারা বলিয়াছেন যে ইন্দ্রিয়লব্ধ বিষয় বাস্তব বা প্রকৃত, কিন্তু ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করিয়া বুদ্ধি যে বিষয়ের পরিচয় পায়, তাহা কেবলমাত্র প্রকৃত নহে, তাহা সত্য অথবা ব্রহ্ম। কাণ্ট কিন্তু সে কথা অস্বীকার করিয়াছেন। বারম্বার এই সত্যই তিনি প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন যে এ অতিক্রমণ ইন্দ্রিয়ের বর্ত্তমানের অতিক্রমণ হইলেও ইন্দ্রিয়ের অতিক্রমণ নহে।

কাণ্টের জ্ঞানতত্ত্বকে প্রকাশ করিয়া বলা চলে, অভিজ্ঞতায় যে প্রকৃতিকে আমরা জানি, তাহা ব্রহ্ম অথবা বাস্তবেরই অংশ। খণ্ডের সঙ্গে সমূহের যে সম্বন্ধ, প্রকৃতির সঙ্গে ব্রহ্মের সম্বন্ধ তাহারি অনুরূপ। ব্রহ্ম এবং প্রকৃতি বিভিন্নধর্ম্মী নহে, বিভিন্ন মনোবৃত্তির বিষয়বস্তু হিসাবে তাহাদের গণনা করা চলে না, এমন কি প্রকৃতিকে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব অথবা কার্য্যফল মনে করিবারও কোন কারণ নাই। ফলে তাহাদের পার্থক্য স্বভাবগত নহে, আমাদের জ্ঞান ক্রমবর্দ্ধমান বলিয়া তাহা বিকাশগত।

• কথাটীকে আরো একটু পরিষ্কার করিয়া বলা বোধ হয় আবশ্যক। আমাদের জ্ঞান ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির সংযোগের ফল। ইন্দ্রিয় কেবলমাত্র দেশকালগত মুহূর্ত্তিক বর্ত্তমানকে প্রকাশ করে, কিন্তু সেই আণবিক সময়ের মধ্যে চিত্ত সীমাবদ্ধ থাকিতে পারেনা। তাই বুদ্ধি প্রতি নিমেষেই সেই আণবিক মুহূর্ত্তকে অতিক্রম করিয়া যায়, কিন্তু বুদ্ধির এই অভিযান কোনকালেই সমস্ত দেশকালের সীমানা পার হইয়া যাইতে পারে না। সংযোজক সার্ব্বভৌম বাক্যের সম্ভাব্যতা এই অতিক্রমণের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। তাই এই প্রকারের বাক্য কেবলমাত্র বিজ্ঞানের সাধারণ সূত্রকেই প্রকাশ করেনা, সমগ্র অভিজ্ঞতায়ই এই প্রকারের বাক্য বর্ত্তমান।

কাণ্টের মতে আমরা ব্রহ্মকে সাক্ষাৎভাবেই জানি। কিন্তু সে জ্ঞান আংশিক এবং সেই কারণে অসম্পূর্ণ। তাহাতে ব্রহ্মের দিক বা খণ্ডবিশেষ প্রকাশ পায় বলিয়াই তাহাকে আমরা প্রকৃতি বলিয়া থাকি। তাহার প্রকৃতি নামের অর্থই এই যে ব্রহ্মের সমগ্রতা আমাদের অভিজ্ঞতার বোধগম্য নহে।

কালপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জ্ঞান বিকাশ লাভ করে, অবস্থানের পরিবর্ত্তনেও নিত্যনূতন সামগ্রী জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়। কিন্তু দেশ ও কালের সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যেও আমাদের জ্ঞান আংশিকই থাকিয়া যায়। ব্রহ্মের বিভিন্ন দিক এবং বিভিন্ন রূপ বিভিন্ন দেশে ও কালে জ্ঞানগোচর হয়, এবং তাহাদিগকে কল্পনা ও স্মৃতিশক্তির সাহায্যে গ্রথিত করিয়া যাহা আমরা পাই, তাহাই আমাদের অভিজ্ঞতার জগৎ। ব্রহ্মের ঐক্য তাই অভিজ্ঞতার পূর্ব্বমীমাংসা, কিন্তু সে ঐক্যকে আমরা কখনই সাক্ষাৎভাবে জানিতে পারি না, অনুমানের সাহায্যে তাহার ধারণা করি মাত্র। অভিজ্ঞতায় বিষয়ীর এবং বিষয়ের ঐক্য এই ঐক্যকেই বিভিন্ন রূপে প্রকাশ করিতেছে। তাহারি ফলে বিভিন্ন অভিজ্ঞতাকে আমরা **আমাদের** অভিজ্ঞতা বলিয়া জানিতে পারি, ইন্দ্রিয়-লব্ধ বিভিন্ন এবং বিচ্ছিন্ন সংবেদনার মধ্যে একই বস্তুর প্রকাশ দেখিতে পাই।

ব্রহ্মের যে অংশ সাক্ষাৎভাবে আমাদের জ্ঞানগোচর, সেখানে সমস্ত সংবেদনাই দেশ ও কালের নিয়মাধীন। সেই সাক্ষাৎ সংবেদনাকে আণবিক মনে করিলে অভিজ্ঞতার কোন বিবরণ দেওয়া যায় না, তাই অসাক্ষাৎ সংবেদনার সঙ্গে তাহাদের যোগ অবশ্যচিন্তনীয়। এই সংযোগকে আকস্মিক অথবা দৈবাৎ মনে করিবার কোন উপায় নাই, কারণ তাহাই আমাদের বস্তুবোধের ভিত্তি। বস্তুর বিশিষ্ট স্বভাবকে প্রকাশ করে বলিয়া বিশেষ বস্তুর বেলায় এই সংযোগরীতি বিভিন্ন, কিন্তু অভিজ্ঞতার সামগ্রী হিসাবে সমস্ত বস্তুরই স্বভাবের যে ঐক্য, সংযোগরীতির উপর তাহারও প্রভাব না থাকিয়া পারে

না। তাই দেশ ও কালের যে সংগঠন সাক্ষাৎ সংবেদনার মধ্যে প্রকাশিত, অসাক্ষাৎ সংবেদনার মধ্যেও তাহার উপস্থিতি না ভাবিয়া আমরা পারি না। তাই কাণ্টের মতে অভিজ্ঞতায় ইন্দ্রিয়লব্ধ বিষয়মাত্রই দেশকালগত, এবং দেশ ও কালের ঐক্য অভিজ্ঞতার সঙ্গতির প্রধান উপকরণ। দেশ ও কালের ঐক্য না থাকিলে অভিজ্ঞতার সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়, তাই দেশ এবং কালের ঐক্য বুদ্ধির পক্ষে অনতিক্রমণীয়। ব্যক্তির সমস্ত অভিজ্ঞতাই তাই দেশকালনির্দ্দিষ্ট, এবং ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধও অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তু বলিয়া এই দেশকাল কেবলমাত্র ব্যক্তিবিশেষের প্রতি প্রযোজ্য নহে, সমস্ত বিশ্বসৃষ্টিরই দেশকাল এক। ফলে দেশ ও কাল কেবলমাত্র ঘটনার সঙ্গে ঘটনার সম্বন্ধের ফল নহে, বরঞ্চ এক অসীম ও অনন্ত দেশ-কালের কাঠামোর মধ্যেই অভিজ্ঞতা বিকশিত হইতেছে।

প্রকৃতি এবং ব্রহ্মের পার্থক্যে কাণ্ট কাল্পনিক বা মানসিকের সঙ্গে বাস্তবের পার্থক্যকে প্রকাশ করিতে চাহেন নাই। তাই তাহার মতে প্রকৃতি চিত্তজাত নহে, বরঞ্চ বস্তু এবং চিত্তের পার্থক্য প্রকৃতিরই অন্তর্ভুক্ত। প্রতিবিম্ববাদের বিরুদ্ধে তিনি তাই বারে বারে বলিয়াছেন যে বস্তুকে জানিয়াই আমরা চিত্তকে জানিতে পারি, বিষয় না থাকিলে বিষয়ীর জ্ঞানও সমানই অসম্ভব। সংযোজক সার্ব্বভৌম বাক্য কি করিয়া সম্ভবপর, তাহাই কাণ্টের প্রধান সমস্যা। ইন্দ্রিয় যে জগৎকে প্রকাশ করে, তাহা আণবিক ও বিচ্ছিন্ন, অথচ অভিজ্ঞতা সংবেদনার মধ্যে আবদ্ধ নহে, বর্ত্তমানকে অতিক্রম করিয়া অতীত ও ভবিষ্যতের সঙ্গে তাহা বর্ত্তমানের সম্বন্ধস্থাপন করিতে চাহে। এ সমস্যার উত্তর প্রতিবিম্ববাদে মেলে না, কারণ

ইন্দ্রিয়লব্ধ বিষয় ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব, একথা বলিলে সংবেদনার সঙ্গে সংবেদনার সম্বন্ধের যে প্রয়োজনীয়তা, তাহার বিষয়ে কিছুই বলা হয় না। জ্ঞানতন্ত্রবাদ এবং বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদও এ প্রশ্ন সম্বন্ধে নিরুত্তর, কারণ অভিজ্ঞতার বিষয় মানসিক অথবা চিত্তবহির্ভূত, যাহাই হউক না কেন, সাক্ষাতের সঙ্গে অসাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার অচ্ছেদ্য বন্ধনের কোন বিবরণই তাহাতে মেলে না। বস্তু ও চিত্তের সত্তার আলোচনা কাণ্টের উদ্দেশ্য নহে, প্রকৃতি ও ব্রহ্মের পার্থক্যেও তাই তিনি স্বভাবের কোন পার্থক্য প্রকাশ করিতে চাহেন নাই। তাঁহার বক্তব্যকে প্রকাশ করিয়া বলা চলে যে ইন্দ্রিয়জ্ঞান সাক্ষাৎ দেশকালের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বুদ্ধি সাক্ষাৎকে অতিক্রম করিয়া যায়, কিন্তু সে অতিক্রমণেও ইন্দ্রিয়জ জগতের সংগঠন ও সংযোগরীতিকে পরিত্যাগ করে না। তাই মনে হইতে পারে যে এই সংগঠন ও সংযোগ-রীতি সমগ্র ব্রহ্মেরই পক্ষে সত্য, সুতরাং তাহারা ব্রহ্মেরই স্বভাবকে প্রকাশ করিতেছে, তাহাদিগকে জানিয়া আমরা ব্রহ্মকে জানিতেছি। এই সংগঠন ও সংযোগরীতি কিন্তু ইন্দ্রিয়লব্ধ নহে, তাহারা বুদ্ধির সামগ্রী, এবং সেই জন্যই কাণ্টপূর্ব্ব বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের ধারণা যে বুদ্ধি দিয়া আমরা ব্রহ্মের স্বভাব জানিতে পারি। ফলে ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির বিষয়ের দ্বিত্বস্বীকার অবশ্যম্ভাবী, এবং অভিজ্ঞতায় তাহাদের সংযোগ রহস্যই থাকিয়া যায়।

এই রহস্যের সমাধান করিবার সাধনায় কাণ্টের বিজ্ঞানবাদের বিকাশ। তিনি দেখিলেন যে ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার সংগঠন ও সংযোগরীতিকে ইন্দ্রিয়াতীত ব্রহ্মের

স্বভাবের পরিচয় মনে করিলে স্ববিরোধী সিদ্ধান্ত অবশ্যম্ভাবী। ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির সংযোগকে স্বীকার করিয়া লইয়া এই সমস্ত মননরীতিকে আমরা যতদূর ইচ্ছা প্রসারিত করিতে পারি। তাহার ফলে ব্রহ্মের নূতন নূতন অংশ এবং রূপ আমাদের জ্ঞানগোচর হয়, বিজ্ঞানের সাধনা বর্ত্তমান এবং ব্যক্তিবিশেষের অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করিয়া মানবচিত্তের সম্মিলিত অভিজ্ঞতায় সমগ্র জগতের পরিচয় দিতে চাহে। কিন্তু ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করিতে চাহিলেই মুস্কিল বাধে, তাহার ফলে জ্ঞানের বিকাশের পরিবর্ত্তে ভ্রান্তির বিস্তার অবশ্যম্ভাবী। তাই কাণ্টের মতে ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধিকে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব, তাহাদের বিষয়বস্তুও স্বতন্ত্র নহে। বুদ্ধি তাই ইন্দ্রিয়াতীত সত্যকে প্রকাশ করিতে পারে না, ইন্দ্রিয়জ বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধস্থাপন করিয়াই তাহাকে তৃপ্ত থাকিতে হয়। বুদ্ধির জ্ঞানে তাই সম্পূর্ণতার সাধনা রহিয়াছে, কিন্তু সাধনা রহিয়াছে এই বোধই সে জ্ঞানের অপূর্ণতার পরিচায়ক। এই অপূর্ণতা-বোধ হইতেই আমরা ব্রহ্মের পূর্ণতার ধারণা করি, কিন্তু তাহা কেবলমাত্র ধারণা থাকিতে বাধ্য। ক্রম-বর্দ্ধনশীল হইয়াও মানুষের জ্ঞান তাই চিরদিনই আংশিক এবং অসম্পূর্ণ। প্রকৃতি এবং ব্রহ্মের পার্থক্যে কাণ্ট এই সত্যকেই প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন,—ইহাই তাঁহার বিজ্ঞানবাদের মর্ম্মকথা।

পাঁচ

ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বুদ্ধির পার্থক্য বিষয়গত বা স্বভাবগত নহে, তাহা আমরা দেখিয়াছি, অন্যপক্ষে বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের মধ্যে দ্বিত্ব-স্বীকার না করিয়াও উপায় নাই। বস্তুতপক্ষে, বিচার করিতে বসিলে ইন্দ্রিয়মুক্ত বুদ্ধির বিষয় যেমন অকল্পনীয়, বুদ্ধিবিমুক্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয়ও সমানই অচিন্তনীয়। সংবেদনায় যাহা প্রকাশিত হয়, তাহাকে সাধারণতঃ আমরা ইন্দ্রিয়জ বলিয়া জানি, কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই দেখা যায় যে, তাহার মধ্যেও বুদ্ধির দান কম নহে। দৃষ্টিতে কেবলমাত্র বর্ণপুঞ্জ সংবেদিত হয়, কিন্তু অভিজ্ঞতায় আমরা বর্ণপুঞ্জকে জানিনা,—আমরা মানুষ অথবা পাহাড়কে মানুষ বা পাহাড়রূপেই দেখিতে পাই। বুদ্ধি সংবেদনায় যে কি ভাবে ক্রিয়াশীল, তাহার একটী দৃষ্টান্ত দিলেই চলিবে। পথে দাঁড়াইয়া তিন নম্বর বাসের জন্য অপেক্ষা করিলে দূরে যে বাসই আসুক না কেন তাহাদের প্রায় সকলগুলিকেই তিন নম্বর বলিয়া মনে হয়। এক কথায় আমরা যাহা দেখিতে চাই, তাহাই দেখি, অর্থাৎ সংবেদনায় আমাদের চিন্তাধারার প্রভাব সুস্পষ্ট। নিজের লেখায় বানান ভুল বা পরিত্যক্ত শব্দও তাই সহজে চোখে পড়ে না—অথচ বানান ভুল যে সংবেদিত হইতেছে, তাহা নিঃসন্দেহ।

ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি কাহাকেও তাই অস্বীকার করা চলেনা। সংবেদনায় যাহা অপূর্ণ থাকে, অনেক ক্ষেত্রেই বুদ্ধি দিয়া আমরা তাহার পূরণ করি, তাই বানান ভুল সংবেদিত হইয়াও ধরা পড়ে না। কিন্তু একেবারে সংবেদনা না থাকিলে বুদ্ধিও

অচল। কান্টের মতে সংবেদনার মধ্যে সংযোগ স্থাপনই বুদ্ধির ধর্ম্ম। সংবেদনায় যাহা আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়, তাহার মধ্যে বিভিন্ন লক্ষণ বা গুণ-নির্ণয় করিয়াই বস্তুবিচার সম্ভবপর। ইন্দ্রিয়জ সংবেদনার বৈচিত্র্য অনন্ত, কিন্তু তাহাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করিতে না পারিলে অভিজ্ঞতা অসম্ভব হইয়া পড়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা চলে যে, এই মুহূর্ত্তে আকাশের সাদানীল বর্ণ বৈচিত্র্য, উড়ন্ত পাখীর বর্ণ বিকাশ, কতগুলি গাছের নানাধরণের সবুজ রঙ, নানান রঙের বহু দালানের বিভিন্ন বর্ণ, রাস্তায় মোটর, লোক, গাড়ী চলাচলের শব্দ, দূরে দালানের ছাদ পেটানোর আওয়াজ, হাওয়ার মৃদুস্পর্শ—প্রভৃতি সহস্র সংবেদনা আমার দৃষ্টি, শ্রবণ ও স্পর্শে আসিতেছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই আমাদের চেতনায় ধরা পড়ে না, আর যদি তাহারা সমস্তই এক সঙ্গে চেতনায় আসিত, তবে বস্তুহিসাবে আমরা কিছুই দেখিতে শুনিতে পারিতাম না, ইন্দ্রিয়জ সংবেদনার প্রাচুর্য্যে ও বিশৃঙ্খলায় বুদ্ধি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িত।

এ সম্বন্ধে আরও একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে। নগরীর কোলাহলের মধ্যেও ঘুমন্ত শিশুর পাশে মা ঘুমায়, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে শিশুর ক্ষীণ কণ্ঠ কাঁদিয়া উঠে, মায়ের ঘুমও সেই মুহূর্ত্তেই ভাঙ্গিয়া যায়। অর্থাৎ বিভিন্ন এবং বিচিত্র সংবেদনার মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া আমরা বিশেষ সম্বন্ধ স্থাপন করি,—এই বিশেষ সম্বন্ধ স্থাপনই বুদ্ধির কাজ। বানরের হাতে যদি এসরাজ দেওয়া যায়, তবে ছড় টানিতে টানিতে হয়তো হঠাৎ সুর বাজিয়া উঠিবে, কিন্তু ওস্তাদ যখন সুর বাজান, তখন তাহা আকস্মিক নহে—তাঁহার মনের ধারণা ও হৃদয়ের আবেগ

সেই সুরের মধ্যে প্রকাশিত হয়, সংবেদনা সেখানে সূত্র অনুসারে গ্রথিত হইয়া সঙ্গীতে পরিণত হয়।

ইন্দ্রিয়জ সংবেদনার মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনই তাই বুদ্ধির ধর্ম্ম, কিন্তু সমস্ত সংবেদনাই দেশকালজ, তাই দেশকালের স্বভাবকে ভিত্তি করিয়াই সে সমস্ত সম্বন্ধ। বুদ্ধির ধর্ম্ম তাই দ্রব্য বা বস্তুরও ধর্ম্ম, কারণ বুদ্ধি দিয়াই আমরা বস্তুকে জানি। বস্তুর সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বাক্যে প্রকাশিত হয়—যাহা অজ্ঞাত, তাহা অপ্রকাশিত, যাহা অপ্রকাশিত তাহা অজ্ঞাত। তাই বাক্যের রূপ বিচার করিয়া আমরা বস্তুর প্রকার বিচার করিতে পারি, বিভিন্ন বস্তুর স্বভাবে দেশকালের ঐক্যের যে বৈচিত্র্য, তাহা জানিতে পারি। বাক্যের স্বভাব বিচার বা ন্যায়শাস্ত্র তাই বস্তুরও সত্তা প্রকাশ করে।

বিভিন্ন সংবেদনা একত্রিত হইয়া ধারণার উদ্ভব, তাই ধারণাকে সংবেদনার যোগসূত্র বলা চলে। কিন্তু ধারণার বিচার করিয়া কাণ্ট দেখিলেন যে সংবেদনার যোগসূত্র বলিয়াই ধারণা সংবেদনার সংযোগের যোগফল হইতে পারে না। সংবেদনার সাদৃশ্য এবং পার্থক্য বিচার করিয়া আমরা বস্তুবোধ লাভ করি। শৈত্য, কঠিনতা, বর্ণ, ভার, ইত্যাদি সংবেদনার সংযোগেই স্বর্ণকে আমরা স্বর্ণ বলিয়া জানি, কিন্তু অন্যপক্ষে স্বর্ণের ধারণা মনের মধ্যে ক্রিয়াশীল না থাকিলে এই সংবেদনাগুলিকেই একত্রিত করিবার প্রবৃত্তি কোথা হইতে আসিল? দৃষ্টি দিয়া যাহাকে বন্ধু বলিয়া চিনিলাম, তাহাকে বন্ধু বলিয়া জানিবার অর্থই এই যে, তাহার প্রকৃতি ও স্বভাব সম্বন্ধে আমার স্পষ্ট ধারণা আছে, কিন্তু সে ধারণা কেবলমাত্র সংবেদনার ফল নহে।

ব্যবহারিক ধারণায় আমরা সাধারণতঃ এই সংবেদনাতীত দিক লক্ষ্য করি না, কিন্তু একটু বিশ্লেষণ করিলেই তাহার মধ্যেও ইহা স্পষ্ট করিয়া ধরা পড়ে। ব্যবহারিক ধারণার তুলনামূলক বিচার করিলে একথা আরো পরিষ্কার হইয়া উঠে, কারণ স্বর্ণ, রৌপ্য, মানুষ, মধু—প্রভৃতি সকলকেই আমরা দ্রব্য বা পদার্থ বলিয়া জানি, কিন্তু তাহার দ্রব্যগুণ বা পদার্থত্ব যে কী, এ প্রশ্ন তুলিলে সংবেদনার মধ্যে আর তাহার উত্তর মেলে না। দ্রব্য কঠিন, কিন্তু দ্রব্য এবং তাহার কাঠিন্য এক নহে। স্বর্ণ উজ্জ্বল, কিন্তু তাই বলিয়া স্বর্ণ কেবলমাত্র ঔজ্জ্বল্য নহে। বর্ণ রূপ রস গন্ধ সমস্তই ইন্দ্রিয়জ। কিন্তু পদার্থ বা দ্রব্য বলিতে আমরা এ সমস্ত ইন্দ্রিয়জ গুণ বা লক্ষণের কথা ভাবিনা। দ্রব্যগুণ বা পদার্থত্ব বলিয়া ইন্দ্রিয়জ কোন সংবেদনা আমরা জানিনা, কিন্তু সমস্ত ইন্দ্রিয়জ সংবেদনার বিশেষ ঐক্যকেই আমরা ধারণায় দ্রব্য বা পদার্থ বলিয়া ভাবি। তাই পদার্থ ইন্দ্রিয়জ সংবেদনার মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনের একটী বিশিষ্ট রীতি।

পদার্থ, কার্য্য-কারণ প্রভৃতি ধারণা তাই অভিজ্ঞতার নিয়ামক। সংবেদনার মধ্যে তাহারা যোগসূত্র স্থাপন করে বলিয়াই আমাদের অভিজ্ঞতা বুদ্ধিগ্রাহ্য। সংবেদনাকে বস্তুভাবে বিচার করিতে গেলেই এই সমস্ত ধারণা কার্য্যকরী, কিন্তু বস্তুবিচার বাক্যে প্রকাশিত হয়, তাই বাক্যের রূপবিশ্লেষণ করিলেই এই সমস্ত ধারণা ধরা পড়ে।

এই ধারণাগুলি সমস্ত অভিজ্ঞতার ভিত্তি, এবং সেই জন্যই সংযোজক সার্ব্বভৌম বাক্য সম্ভব। সংবেদনার মধ্যে তাহারা ঐক্য স্থাপন করে, কিন্তু সংবেদনা ইন্দ্রিয়জ হিসাবে দেশ-

কালজাত। দেশ ও কালের প্রকৃতিতে বৈচিত্র্য নাই বলিয়া অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য দেশকালজ নহে, তাহা আমরা দেখিয়াছি। সেই কথাই ঘুরাইয়া বলা চলে যে অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য দেশ-কাল নিরপেক্ষ, এবং দেশকাল-নিরপেক্ষ বলিয়াই তাহা সার্ব্বিক। পক্ষান্তরে, বৈচিত্র্য-বোধেই জ্ঞানের উদয় বলিয়া অভিজ্ঞতা সর্ব্বত্রই সংযোজক। সংশ্লেষণের পূর্ব্বে দেশকাল থাকিলেও তাহা আমাদের বুদ্ধিগ্রাহ্য নহে, সংশ্লেষণেই অভিজ্ঞতার আরম্ভ। সার্ব্বিকতা এবং সংযোজনা—এই দুইয়ের মিলনই তাই অভিজ্ঞতা।

এইভাবে কাণ্ট অভিজ্ঞতায় সার্ব্বিকতার পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিলেন। হিউম বলিয়াছিলেন যে, সমস্ত অভিজ্ঞতাই কালজ, তাই কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বলিয়া কোন সার্ব্বিক সম্বন্ধ নাই, থাকিলেও আমরা তাহা জানিতে পারি না। আমরা অভিজ্ঞতায় প্রথমে অগ্নি এবং পরে ভস্ম দেখিতে পাই, কিন্তু তাই বলিয়া অগ্নির সঙ্গে ভস্মের কার্য্যকারণ সম্বন্ধ স্থাপন করা চলে না। প্রথমে পুত্র এবং পরে পিতাকে দেখাও অভিজ্ঞতায় বিরল নহে, তাই বলিয়া পুত্রকে পিতার কারণ বলা অসঙ্গত। অগ্নির সম্বন্ধে আমরা যতই চিন্তা করিনা কেন, কেবলমাত্র সেই চিন্তা দিয়া ভস্মকে জানা যায় না—তাহার জন্য অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। হিউমের মতে তাই কার্য্যকারণ এবং পূর্ব্বপর, এই দুই ধরণের সম্বন্ধের মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই,—উভয় ক্ষেত্রেই আমরা একটী অভিজ্ঞতার পরে আর একটী অভিজ্ঞতা লাভ করি, কিন্তু অভিজ্ঞতা দুইটীর মধ্যে কোন সম্বন্ধ স্থাপন আমাদের ক্ষমতার অতীত, সার্ব্বিকতাও তাই মানুষের অন্তরের কল্পনা মাত্র।

ইহার উত্তরে কাণ্ট বলিলেন যে, কার্য্যকারণ এবং পূর্ব্বপর সম্বন্ধের পার্থক্য যদি আমরা স্বীকার না করি, তবে পূর্ব্বপর সম্বন্ধকেও স্বীকার করা চলে না। ঘরে বসিয়া আমরা প্রথমে ছাদ এবং পরে মাটীর দিকে তাকাইতে পারি,—এক্ষেত্রে একটী অভিজ্ঞতার পরে আর একটী অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করিতেছি। চলন্ত নৌকায় বসিয়া প্রথমে তালগাছ দেখিলাম, খানিক পরে দেখিলাম একটা অট্টালিকা। এক্ষেত্রেও একটী অভিজ্ঞতার পর আর একটা অভিজ্ঞতা পাইতেছি। কেবলমাত্র সংবেদনার দিক হইতে এই দুই ক্ষেত্রে কোনই পার্থক্য নাই, দুই ক্ষেত্রেই "ক"য়ের পরে "খ" সংবেদিত হইতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া ছাদকে কেহ ভিত্তির পরে বলিতে পারে না—ছাদ এবং ভিত্তি সমসাময়িক, কিন্তু নৌকার অবস্থান দুইটী সমসাময়িক নহে। তাই কেবলমাত্র সংবেদনার বিবেচনা করিলে উভয় ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, কিন্তু একথা স্বীকার করার অর্থই এই যে বাস্তবিক পক্ষে পূর্ব্বপর বলিয়া কিছু নাই। প্রকৃতপক্ষে আগুন আগে না ভস্ম আগে, ছাদ আগে না ভিত্তি আগে, এ সব প্রশ্নেরও তাহা হইলে কোন অর্থ হয় না, কেবলমাত্র বলা চলে যে আমরা কখনো আগুন, কখনো ভস্ম, কখনো ছাদ, কখনো ভিত্তি দেখি। সমস্ত পূর্ব্বপর তাই আমাদের মননধারায়।

একথা স্বীকার করিলে কিন্তু অভিজ্ঞতা আর অভিজ্ঞতা থাকে না। তাহার সুসংবদ্ধ রূপের পরিবর্ত্তে অনিয়ন্ত্রিত আকস্মিক মনন স্বপ্নের প্রলাপের মত হইয়া দাঁড়ায়। কাণ্ট কিন্তু তাহাতেও ক্ষান্ত হন নাই। তিনি দেখাইলেন যে মননধারার পূর্ব্বপরেরও তাহা হইলে কোন অর্থ থাকে না। বাহ্যিক

জগতের সঙ্গে তুলনায়ই আমরা মননের পৌর্ব্বাপর্য্য জানি, তাহা না হইলে কেবলমাত্র মনন রীতির মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে তাহাদের ক্রমিক বিকাশও ধরা পড়ে না। ছাদ দেখিয়া আমরা ভিত্তি দেখিতে পারি, আবার ভিত্তি দেখিয়াও ছাদ দেখিতে পারি, কিন্তু কেবলমাত্র মননরীতি বিচার করিয়া তাহাদের মধ্যে পৌর্ব্বাপর্য্য স্থির করা অসম্ভব। সমস্ত পৌর্ব্বা-পর্য্য সাময়িক, কিন্তু কালের পৌর্ব্বাপর্য্য নাই। এক প্রকারের অভিজ্ঞতার পরে আর এক প্রকারের অভিজ্ঞতার উদ্ভব হয়, কিন্তু সমস্ত কালপ্রবাহই একক, তাহার পূর্ব্বপর নাই। সেই কথাকেই ঘুরাইয়া বলা চলে যে সমস্ত পরিবর্ত্তনই কালসাপেক্ষ বলিয়া কাল পরিবর্ত্তনশীল হইতে পারে না। কাল পরিবর্ত্তন-শীল নহে এবং সেইজন্যই আমাদের জ্ঞানের অগোচর। ঘটনাই আমরা জানি, এবং ঘটনার পৌর্ব্বাপর্য্য আমাদের বিচার্য্য, কিন্তু যে কালপ্রবাহে তাহাদের অবস্থান, তাহা অজ্ঞাত থাকিয়া যায়। তাই ঘটনার অভিজ্ঞতা হইতে আমরা কালের ধারণা করি, কাল প্রবাহকে জানিয়া ঘটনার অবস্থান নির্দ্দেশ করি না। এক কথায় মনন অথবা সংঘটন,—সমস্ত পৌর্ব্বা-পর্য্যই আমাদের জ্ঞানের বিষয়বস্তু, অথচ কাল প্রবাহের অভিজ্ঞতায় সে পৌর্ব্বাপর্য্য নির্দ্ধারিত হয় না।

কাণ্টের মতে অভিজ্ঞতাকে সুসংবদ্ধ করিতে হইলে সংশ্লেষণ অনিবার্য্য। কিন্তু এ সংশ্লেষণ স্বেচ্ছাচারী নহে, তাহার বিশিষ্ট রূপ বা ধারা আছে। বিভিন্ন সংবেদনা সাজাইয়াই অভিজ্ঞতা। কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংগঠনের রূপ বিভিন্ন। সঙ্গীতে যে স্বরসংবেদনা, তাহাকে এককালীন ভাবা চলে না, আবার গৃহের ভিত্তি ও ছাদকে ক্রমিক

ভাবিলেও সমানই বিপদ। অভিজ্ঞতার সম্ভাবনা বস্তু-বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত. এবং বস্তুকে বস্তু বলিয়া জানিতে হইলে সংবেদনার সংগঠনকে কোন ক্ষেত্রে এককালীন, কোন ক্ষেত্রে ক্রমিক ভাবিতে আমরা বাধ্য। বস্তুর সংগঠন সমসাময়িকই হোক অথবা অনুবর্ত্তনশীল হোক—আমরা কিন্তু বস্তুকে পরিবর্ত্তনশীল সংবেদনা দিয়াই জানি। আগুনে কাগজ জ্বালাইলে ভস্মীভূত হয়। সেখানে আমরা প্রথমে কাগজ এবং পরে ভস্ম দেখি, কিন্তু তেমনিভাবে তাজমহলের উত্তর দিক দেখিবার পরে দক্ষিণ দিক আমরা দেখিতে পাই, অথচ তাই বলিয়া একথা বলা চলে না যে উত্তর দিক দক্ষিণ দিকের পূর্ব্ববর্ত্তী। সঙ্গীত শুনিতে হইলে বা ভস্মকে কাগজের ভস্ম বলিয়া জানিতে হইলে সংবেদনার পর্য্যায় অনির্দ্দিষ্ট থাকিতে পারে না, কিন্তু তাজমহলের উত্তর অথবা দক্ষিণ, যে ভাবেই আমরা দেখিনা কেন, তাজমহল তাজমহলই থাকিয়া যায়। একক্ষেত্রে পর্য্যায় স্থির এবং নির্দ্দিষ্ট, অন্যক্ষেত্রে পর্য্যায়ের কোন স্থিরতার প্রয়োজন নাই। এই পার্থক্যের ভিত্তিকেই কাণ্ট কার্য্যকারণ বোধ বলিয়াছেন।

কার্য্যকারণ বোধ দিয়া বিশেষ কারণের বিশেষ ফল যে কী তাহা আমরা জানিতে পারি না, কিন্তু কার্য্যকারণ বোধ অভিজ্ঞতার ভিত্তি। বিজ্ঞানে সার্ব্বিক সত্য প্রকাশিত হয়, কিন্তু অভিজ্ঞতার মধ্যেই তাহারা সীমাবদ্ধ। সংবেদনার সংগঠনরীতি সমস্ত ধারণার মূলে, তাই ধারণা কোন দিন সংবেদনাকে অতিক্রম করিতে পারে না। ঘটনার সঙ্গে ঘটনার সম্বন্ধ, সমস্ত পৌর্ব্বাপর্য্য,-- কার্য্যকারণ বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু ব্রহ্মের সত্তায় বিভিন্ন ঘটনা বিচ্ছিন্ন নহে, ব্রহ্মের স্বভাব বিচারে আমাদের ধারণা তাই নিষ্ক্রিয়।

অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তুর বেলা বিজ্ঞান তাই সার্ব্বিক, কিন্তু অভিজ্ঞতার বাহিরে তাহার প্রয়োগ নাই। ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি দুই-ই অভিজ্ঞতায় সক্রিয়। সংবেদনা ও ধারণার সম্মিলনই অভিজ্ঞতা। কিন্তু তাহার ফলে ব্রহ্ম আমাদের জ্ঞানাতীত থাকিয়া যায়, ব্রহ্মের বেলা আমাদের ধারণার প্রয়োগ নাই। অথচ ব্রহ্মের কথা না ভাবিয়াও যে উপায় নাই তাহা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। অভিজ্ঞতার মধ্যেই তাই আত্মদ্বন্দ্বের আভাস মেলে। এক পক্ষে অভিজ্ঞতার বিষয়-বস্তু বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়ের সহযোগিতায় জ্ঞানগোচর। যাহার সংবেদনা বা ধারণা নাই, তাহার সম্বন্ধে কোন কিছুই বলা চলে না। অন্যপক্ষে সংবেদনা বা ধারণায় বস্তুর প্রকৃতির সম্পূর্ণ প্রকাশও অসম্ভব, অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তু অভিজ্ঞতায়ও সম্পূর্ণ আত্মপ্রকাশ করে না।

অভিজ্ঞতার মধ্যে বিজ্ঞানের সার্ব্বিকতার ফলে আমরা কিন্তু সে কথা ভুলিয়া যাই, ভাবি যে বিজ্ঞানের সত্য কেবল-মাত্র অভিজ্ঞতায়ই কার্য্যকরী নহে, ব্রহ্মের প্রকৃতিও তাহাতে প্রকাশিত হয়। বিশেষ ঘটনার সঙ্গে বিশেষ ঘটনার সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া বিজ্ঞান যে সূত্র প্রতিষ্ঠা করে, অভিজ্ঞতার সর্ব্বত্রই তাহার প্রয়োগ সার্থক। তখন বিজ্ঞান ভাবে যে বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে যে সূত্র কার্য্যকারী, সমস্ত ঘটনার সমগ্রতা বা ব্রহ্মের পূর্ণতার মধ্যেই বা তাহা কার্য্যকরী হইবে না কেন? ব্রহ্ম এবং প্রকৃতির পার্থক্যের বিজ্ঞানে স্থান নাই। প্রকৃতিকেই বিজ্ঞান ব্রহ্ম বলিয়া ভাবে, এবং তাহার ফলে ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞানের সাধনায় আত্মবিনাশ করে।

বিষয়ী, বিশ্ব এবং ঈশ্বর—এই তিনটী ধারণার বিচারেই

বিজ্ঞানের আত্মদ্বন্দ্ব পরিস্ফুট। সমস্ত অভিজ্ঞতার মূলে বিষয়ী, অভিজ্ঞতার সমগ্রতাই বিশ্ব, এবং বিষয়ী ও বিশ্বের পরিপূর্ণতায়ই ঈশ্বর। কোনটীই অভিজ্ঞতায় প্রকাশিত হয় না, কারণ সমস্ত সংবেদনা এবং ধারণার তাহারা মূলে, এবং অভিজ্ঞতার মূলে বলিয়া তাহারা অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তু নহে। প্রকৃতপক্ষে কোনটীই তাই ধারণা নহে, তাহারা সমস্ত ধারণায় কার্য্যকরী, সমস্ত ধারণার আদর্শ, এবং আদর্শ বলিয়াই তাহারা অলব্ধ।

সে কথাকে ঘুরাইয়া বলা চলে যে মানুষের জ্ঞান-সাধনার লক্ষ্য সমগ্রতা ও ঐক্য। তাই জ্ঞানের যে বিষয়ী, তাহাকে সম্পূর্ণ ও একক না ভাবিয়া আমাদের শান্তি নাই। জ্ঞানের যাহা বিষয়, তাহারও সম্পূর্ণতা ও একত্ব না দেখাইতে পারিলে সত্যের নিত্যতার ভরসা নাই। ঈশ্বর বা ব্রহ্মের উপর আস্থা সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত সাধনার ভিত্তি। কিন্তু সমগ্রতা ও ঐক্য আমাদের সাধনার লক্ষ্য, তাই সে সমগ্রতা বা ঐক্য কোন দিনই আমাদের জ্ঞানগোচর হইতে পারে না। আমরা জ্ঞানের সীমারেখা প্রসারিত করিয়া যাইতে পারি, সীমারেখার অনন্তপ্রসারের স্বপ্ন দেখিতে পারি, কিন্তু অনন্ত প্রসারিত জ্ঞান আমাদের বুদ্ধির বিষয়বস্তু বলিয়া ভাবিতে গেলেই স্ববিরোধ অনিবার্য্য। অংশের বেলায় যাহার প্রয়োগ চলে, সম্পূর্ণকে তাহার দ্বারা মাপিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইতে বাধ্য।

বিষয়ী না থাকিলে সংশ্লেষণের কোন অর্থই হয় না। তাই অভিজ্ঞতার বিবরণে বিষয়ীকেও বাদ দেওয়া চলে না। ইন্দ্রিয় যে বিষয়কে প্রকাশ করে, তাহা দেশকালজ। কালজ হিসাবে তাহার প্রকাশ ক্রমশীল, কারণ মুহূর্ত্তিক অভিজ্ঞতা-

সমূহকে সংগঠন করিয়াই অভিজ্ঞতার পূর্ণতা! এই পূর্ণতাও কখনোই সম্পূর্ণ নহে, তাহাও ক্রমশঃ অভিজ্ঞতায় প্রকাশিত হইতেছে। এ বিবরণে দ্রষ্টব্য এই যে, অভিজ্ঞতা কালজ-হিসাবে ক্রমশীল, সুতরাং বিভিন্ন ক্রমের মধ্যে যদি একই বিষয়ী জাগ্রত না থাকে, তবে বিষয়গুলিকে ক্রমশীল বলিয়া জানা যায় না। অতীত মুহূর্ত্তের অভিজ্ঞতাপুঞ্জকে কল্পনায় সঞ্জীবিত করিয়া বর্ত্তমানের সঙ্গে তাহাদের সংগঠনের ফলেই অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তু, সুতরাং জ্ঞান প্রতিপদে কল্পনার সহায়-প্রার্থী। কল্পনা যখন দেশকালের ঐক্যসঙ্গত রূপ পায়, তখনই আমরা তাহাকে বলি জ্ঞান। তাহার জন্য যেমন একপক্ষে বিষয়ীর প্রয়োজন, অন্যপক্ষে বিষয় না হইলেও তাহার চলে না। বস্তুতঃ, বিষয়হীন বিষয়ীর পরিচয় অভিজ্ঞতায় মেলে না, কাজেই বিষয়ীকেও আমরা পারমার্থিক সত্তা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। যতদূর অভিজ্ঞতার প্রসার, যতদূর পর্য্যন্ত বিভিন্ন বিষয় সংশ্লেষণের ফলে জ্ঞানগোচর, ঠিক সেই পর্য্যন্তই আমরা বিষয়ীর কথাও জানি। সৃষ্টির সমস্ত রহস্য যেমন অনন্ত-প্রকাশমান, বিষয়ীর সম্পূর্ণতা ও ঐক্যও তেমনি ক্রমপ্রকাশমান, সে প্রকাশের কোনদিন শেষ হইবে বলিয়া আমরা কল্পনাও করিতে পারি না।

সমগ্র বিশ্বের কোন ধারণাও তাই আমরা করিতে পারি না—করিবার প্রয়াসও ব্যর্থ হইতে বাধ্য। বিজ্ঞানে অভিজ্ঞতা লইয়াই আমাদের কারবার, এবং অভিজ্ঞতার অর্থই বিশেষ অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতার সমষ্টির কোন অভিজ্ঞতা মানুষের নাই, অথচ বিশ্ব (অর্থাৎ পূর্ণজ্ঞানের বিষয়) বলিলে অভিজ্ঞতার সমগ্রতাই বোঝায়। তাই বিশ্বের বিষয় কোনকথা বলিতে

গেলেই পদে পদে স্ববিরোধ প্রকাশ পায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ জিজ্ঞাসা করা চলে বিশ্ব সীমাবদ্ধ না অসীম ? সীমাবদ্ধ বলিলেই প্রশ্ন উঠে যে সীমার বাহিরে কি ? কিসের দ্বারা বিশ্বের সীমা নির্দ্দিষ্ট ? আবার অসীম বলিলেও অসীম বিশ্বের ধারণা করা যায় না। যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে পৃথিবীর আদি অন্ত আছে, না বিশ্ব অনাদি ও অনন্ত, তাহা হইলেও প্রশ্নের কোন সদুত্তর নাই। কার্য্যকারণ বোধ লইয়াও এ সমস্যা উঠে, কারণ অভিজ্ঞতায় সমস্ত ঘটনারই কারণ আছে, কিন্তু বিশ্বের কি কোন কারণ থাকিতে পারে ? অভিজ্ঞতার সমগ্রতাই বিশ্ব, তাই যে কারণের কথাই আমরা ভাবিনা কেন, তাহা বিশ্বেরই অন্তর্গত। আবার অকারণ বিশ্বের কথাও আমরা ভাবিতে পারি না। অবাস্তব হইতে বাস্তবের উদ্ভব কেমন করিয়া সম্ভব ?

ঈশ্বর আছেন কি নাই, তাঁহার প্রকৃতি কি,—তাহা লইয়াও এ সমস্ত সমস্যা উঠে। ঈশ্বর না থাকিলে বিশ্বকে সৃষ্টি করিল কে, এ যুক্তির কোন মূল্য নাই, কারণ ঈশ্বর স্বয়ম্ভু হইতে পারিলে সৃষ্টিই বা স্বয়ম্ভু হইতে পারিবে না কেন ? ব্রহ্মের সত্তা সমস্ত অভিজ্ঞতার মূলে, কিন্তু ব্রহ্মের প্রকৃতি যে শুভ ও কল্যাণকর, তাহার প্রমাণ কি ? এক কথায় দর্শনে আমরা ব্রহ্মের পরিচয় পাইতে পারি, কিন্তু ঈশ্বরের পরিচয় দর্শন দিতে পারে না। ঈশ্বর বলিতে সত্য, শিব এবং সুন্দর বোঝায়, কিন্তু অভিজ্ঞতায় যে বিশ্ব আমাদের কাছে প্রকাশিত, তাহার মধ্যে অসত্য, অশুভ এবং অসুন্দরেরও আভাস আছে। তাই বিজ্ঞানের পন্থায়, বুদ্ধি এবং ধারণার সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা ব্যর্থ হইতে বাধ্য।

কাণ্টের বক্তব্য এই যে ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই, কারণ অভিজ্ঞতা লইয়াই বিজ্ঞানের কারবার। দেশ, কাল, পদার্থ, কার্য্যকারণ প্রভৃতি ধারণা অভিজ্ঞতার মূলে, তাই অভিজ্ঞতার মধ্যে বিজ্ঞানের সূত্র সার্ব্বিক, কিন্তু অভিজ্ঞতার বাহিরে তাহাদের প্রয়োগের চেষ্টা করিলেই সমস্যা অনিবার্য্য। বিজ্ঞান ব্রহ্ম এবং প্রকৃতির পার্থক্য বিষয়ে সজাগ নহে, ব্রহ্মের স্বভাব নির্ণয়ও বিজ্ঞানের লক্ষ্য নয়। তাই বিজ্ঞানে দেশ, কাল এবং ধারণার অপ্রতিহত প্রভাব। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে ব্রহ্মের সঙ্গে প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচারের কথা উঠে, বিজ্ঞানের ব্যবহারিক সত্য ছাড়িয়া আমরা দর্শনের পারমার্থিক সত্য নির্ণয়ের প্রয়াস পাই, সেই মুহূর্ত্তেই দেশ, কাল এবং মনন-রীতির প্রকৃতি-নির্ভরতার প্রশ্ন আমাদের বিচার্য্য।

কথাটিকে ঘুরাইয়া বলা চলে যে বিজ্ঞানে কোন প্রশ্নেরই ব্যাখ্যা নাই। আগুনে কাগজ পোড়ে, কিন্তু কেন পোড়ে সেকথা কেহ বলিতে পারে না। বিজ্ঞান তাহা বলিবার চেষ্টাও করে না। কার্য্যকারণের সূত্রে তাই ব্যবহারের সাদৃশ্য প্রকাশ পায়, কিন্তু ব্যবহারের তাৎপর্য্যের কোন স্থান তাহার মধ্যে নাই। তাই বিশেষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে বিশেষ অভিজ্ঞতার সম্বন্ধ স্থাপনে বিজ্ঞানের সফলতা, কিন্তু যে প্রণালীতে তাহা সম্ভব, অভিজ্ঞতার সমগ্রতার বেলা তাহার প্রয়োগ স্ববিরোধী।

কাণ্টের দর্শনবিচারের এ সিদ্ধান্তে কিন্তু সহজে তৃপ্ত হওয়া চলে না। বিজ্ঞানের বিজয় অভিযান বুদ্ধিরই আত্মপ্রকাশ, তাই বিজ্ঞানের সার্ব্বিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই তাঁহার দর্শন প্রচেষ্টা, কিন্তু তাঁহার আলোচনার ফলে বিজ্ঞানের

জগতের নিত্যতাই অস্বীকৃত হইয়া পড়ে। ব্যবহারিক সত্য লইয়াই বিজ্ঞানের কারবার, ব্যবহারিক জগতেই বিজ্ঞান আবদ্ধ। কিন্তু এই সঙ্কোচনের অর্থই এই যে চরম সত্য বিজ্ঞানের আয়ত্তে নহে। বিজ্ঞানের সার্ব্বিকতাকে প্রমাণ করিতে গিয়া কাণ্ট তাই বিজ্ঞানের একদর্শিতাকেই প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন।

মানবাত্মার আত্মোপলব্ধি ও গৌরববোধের বিজয়গানও তাঁহার দর্শনবিচারের লক্ষ্য। বিজ্ঞানের সার্ব্বিকতার সঙ্গে তাহার কোন সংঘর্ষ নাই, ইহাই তাঁহার প্রতিপাদ্য, কিন্তু তাঁহার আলোচনার ফলে এই দাঁড়ায় যে মানুষের ধর্ম্মানুভূতিরও কোন যৌক্তিকতা নাই। বুদ্ধি দিয়া কোনদিন ধর্ম্মকে প্রমাণ করা চলে না। ধর্ম্মে বিশ্বাস আমাদের যুক্তির অতীত।

বিজ্ঞানের জগৎ ব্যবহারিক বলিয়া তিনি বিজ্ঞানের সার্ব্বিকতার প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছেন, ধর্ম্মবোধ বুদ্ধির অতীত বলিয়া ধর্ম্মকে বাঁচাইতে চাহিয়াছেন, কিন্তু এ উত্তর বৈজ্ঞানিক বা ধার্ম্মিক কাহাকেও তৃপ্ত করে না, করিতে পারেও না। তাই কাণ্টের এক জীবনীকার বলিয়াছেন, ফরাসী বিপ্লবী রবস্‌পীয়রের চেয়েও কাণ্ট বড় বিপ্লবী। রবস্‌পীয়র কেবলমাত্র একজন রাজা ও কয়েক সহস্র ফরাসীকে হত্যা করিয়াছিলেন। কিন্তু কাণ্টের হাতে বিজ্ঞানের সত্য এবং ধর্ম্মসাধনার ঈশ্বর, কেহই নিস্তার-পান নাই।

ছয়

বিষয় ও বিষয়ীকে অভিজ্ঞতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিয়া কাণ্ট সংযোজক সার্ব্বভৌম বাক্যের সম্ভাব্যতা প্রমাণ করিয়াছেন, কিন্তু যান্ত্রিকতার সঙ্গে মানবাত্মার স্বাধীনতার যে সংঘর্ষ, তাহার কোন সন্তোষজনক বিবরণ ইহাতে মেলে না। বিষয়ীকে অভিজ্ঞতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিলে বিষয়ী দেশকালজ হইয়া পড়িতে বাধ্য, এবং তাহা হইলে দেশকালের স্বভাবের যে ঐক্য, তাহা বিষয়ীর প্রতিও প্রযোজ্য। তাহা হইলে কিন্তু বিষয়ীর স্বাধীনতার কোন অর্থ থাকে না, কারণ বুদ্ধি দেশকালের স্বভাবসঙ্গত যে ঐক্য অভিজ্ঞতার মধ্যে খুঁজিয়া পায়, তাহার মধ্যে স্বাধীনতা বা আকস্মিকতার কোন অবকাশ নাই। অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য কেবলমাত্র দেশকালজ নহে বলিয়াই সে বৈচিত্র্যের উপলব্ধি কার্য্যকারণ সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা না হইলে পর্য্যয়ের সংবেদনা এবং সংবেদনার পর্য্যয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকিত না। ফলে অভিজ্ঞতায় যে বিষয়ী আত্মপ্রকাশ করে, সে বিষয়ীর বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহার প্রত্যেক অবস্থাই পূর্ব্ব অবস্থার কার্য্যফল মাত্র, কিন্তু তাহা হইলে কর্ত্তব্য অথবা নৈতিক স্বাধীনতার কোন অর্থই থাকে না। স্বভাবের নিয়মে যাহা ঘটে, তাহা তথ্য, কাজেই তাহাকে ভালো অথবা মন্দ বলা সমান অর্থহীন। স্বভাবের নিয়মশৃঙ্খলে কর্ত্তব্যের কোন স্থান নাই। বিষয়ীকে দেশকালাধীন ভাবিলে তাই বিষয়ীর স্বাধীনতাকেও অস্বীকার করা হয়।

মানুষের দায়িত্ববোধ রক্ষা করিতে গিয়া কাণ্ট তাই বলিয়াছেন, অভিজ্ঞতায় যে জগৎ আমাদের কাছে প্রকাশিত, তাহার সর্ব্বত্রই পৌর্ব্বাপর্য্যের অলঙ্ঘনীয় শৃঙ্খল। তাই বিষয় এবং বিষয়ী উভয়েই সেখানে কার্য্যকারণের সম্বন্ধাধীন, কিন্তু সে জগতের পারমার্থিক কোন সত্তা নাই বলিয়া তাহার শৃঙ্খলাও কেবলমাত্র ব্যবহারিক। অভিজ্ঞতার এ জগৎ যে কেবলমাত্র ব্যবহারিক, তাহার স্বপক্ষে কাণ্ট অনেক যুক্তি দিয়াছেন। তাহার মধ্যে কেবলমাত্র দুইটি যুক্তি আমরা এখানে লক্ষ্য করিতে পারি। কল্পনানিয়ন্ত্রন করিয়াই আমাদের জ্ঞান, কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত কল্পনাও দেশকালজ। অনিয়ন্ত্রিত কল্পনাও কিন্তু অভিজ্ঞতার সামগ্রী, তাই দেশ ও কাল অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না। অভিজ্ঞতার সর্ব্বত্রই দেশকালের ব্যবহার, সমস্ত অভিজ্ঞতার আধার হিসাবে তাহাদের ব্যবহারিক সত্তা তাই নিঃসন্দেহ, কিন্তু অভিজ্ঞতার মধ্যে সীমাবদ্ধ বলিয়া তাহাদের পারমার্থিক সত্তা সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। কিন্তু কাণ্ট তাহা বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই। তিনি বলিয়াছেন, তাহাদের স্বভাব স্ববিরোধী বলিয়া দেশকালের পারমার্থিক সত্তা নাই। দেশকালের কথা ভাবিলেই তাহাদিগকে অসীম অথচ সম্পূর্ণ ভাবিতে হয়। তাহাদের স্বভাবের দুইদিকের এই বিরোধই প্রমাণ করে যে তাহারা পারমার্থিক নহে, কেবলমাত্র ব্যবহারিক।

দ্বিতীয়ত, অনিয়ন্ত্রিত কল্পনাও দেশকালজ বলিয়া কেবলমাত্র দেশকাল দিয়া আমরা বাস্তব অবাস্তবের পার্থক্য বুঝিতে পারি না। তাহার জন্য কল্পনা ও প্রত্যক্ষের পার্থক্য-বোধ প্রয়োজন, অথচ কেবলমাত্র বিষয়বিচারে তাহা সম্পন্ন

হয় না। মাতাল যখন বলে, গোলাপী ইঁদুর রাস্তা ভরিয়া ছুটাছুটি করিতেছে, তখন অভিজ্ঞতা হিসাবে তাহা প্রত্যক্ষ না কল্পনা সে কথা বলিবার কোন উপায় নাই। গোলাপী ইঁদুর বাস্তব কি অবাস্তব, তাহা জানিবার একমাত্র উপায় অন্যান্য অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাহার সম্বন্ধবিচার। আমাদের অভিজ্ঞতার যে নিত্য পরিবর্ত্তন, তাহার মধ্যে কোনগুলির জন্য বিষয়ী নিজে দায়ী, কোনগুলি বিষয়জ, তাহা স্থির না করিতে পারিলে কল্পনার সঙ্গে প্রত্যক্ষের পার্থক্যবোধ অসম্ভব। তাই সংবেদনার পর্য্যয় ও পর্য্যয়ের সংবেদনার প্রভেদ-বোধকেই বস্তু-বোধ বলা যাইতে পারে, এবং কার্য্যকারণ সম্বন্ধের উপর তাহা প্রতিষ্ঠিত। পক্ষান্তরে, সত্য মিথ্যাও এই পার্থক্যবোধের সঙ্গে জড়িত, কারণ বস্তুবোধ না থাকিলে কল্পনার আসঙ্গের সঙ্গে জ্ঞানের প্রভেদও লক্ষ্য করা যায় না। ফলে বস্তুবোধ বুদ্ধির এ পার্থক্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সেই জন্য অভিজ্ঞতার জগৎও বুদ্ধি-তান্ত্রিক বলিয়া ব্যবহারিক। তাহাতে কিন্তু জগতের পারমার্থিক সত্তার আমরা পরিচয় পাই না, কারণ আমাদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সমপ্রসার এবং সে অভিজ্ঞতার মূলে রহিয়াছে বুদ্ধির বস্তুবোধ।

অভিজ্ঞতার জগৎ ব্যবহারিক বলিয়া তাহার শৃঙ্খলাও কেবলমাত্র ব্যবহারিক। কর্ত্তব্য-বোধে আমরা প্রত্যেকেই জানি যে মানবাত্মার স্বাধীনতা কিন্তু কেবলমাত্র ব্যবহারিক নয়। বিজ্ঞান যাহাই বলুক না কেন, প্রকৃতির নিয়মকে লঙ্ঘন করিয়া আমরা আদর্শ রচনা করি। বিজ্ঞান আমাদের পর্য্যবেক্ষণকে প্রসারিত করে, কিন্তু পৃথিবীর পারমার্থিক

সত্তাকে প্রকাশ করিতে পারে না। সৃষ্টির সেই পারমার্থিক সত্য 'কর্ত্তব্যবোধে আমাদের কাছে উদ্ভাসিত হয়, কারণ কর্ত্তব্যবোধ ব্যক্তির প্রবৃত্তিজাত বা কল্পনাপ্রসূত নহে, তাহা ব্যক্তির মধ্যে বুদ্ধির স্বকীয় স্বভাবের আবির্ভাব।

কথাটীকে ঘুরাইয়া বলা চলে যে বিষয়ীর মানস ইতিহাসে বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ, তাই বিভিন্ন বিষয়ীর মানস ইতিহাসও বিচিত্র। ভিন্ন লোকের ভিন্ন রুচি, তাই আমাদের কাজকর্ম্ম, আমাদের পছন্দ অপছন্দের মধ্যেও বিভিন্ন স্বভাবের প্রকাশ। মনস্তত্ত্বে মানুষের যে প্রকৃতির পরিচয় মেলে, তাহাকে বিজ্ঞানের বিষয় বলিয়া ভাবা যায়। ভিন্ন লোকের ভিন্ন কর্ম্মপদ্ধতি, ভিন্ন চিন্তাধারার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও তাই আমাদের বোধগম্য। মানুষের চরিত্রবিচারেও তাই অতীত ইতিহাস, বংশপরিচয়, অবস্থা সংস্থান প্রভৃতিকে অবহেলা করা চলে না।

বিষয়ী কার্য্যকারণসূত্রের অধীন বলিয়া ব্যবহারিক। তাহা হইলে আত্মার স্বাধীনতার সম্ভাবনা কোথায়? বিজ্ঞানও ব্যবহারিক, তাই বিজ্ঞানের কার্য্যকারণ সূত্রের প্রয়োগ অভিজ্ঞতার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু বিষয়ী ও বিষয়, উভয়েই যদি ব্যবহারিক বলিয়া প্রতিভাত হয়, তবে ব্রহ্মের পারমার্থিক সত্তার কি কোন অর্থ থাকে? থাকিলেও আমরা কি তাহার কল্পনাও করিতে পারি?

কর্ত্তব্যবোধের মধ্যে কাণ্ট এই পারমার্থিক সত্যের আভাস দেখিয়াছেন। অভিজ্ঞতায় কর্ত্তব্যবোধের মতন অপূর্ব্ব বা আশ্চর্য্য কিছুই নাই, কারণ প্রকৃতির সমস্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যে, মানুষের স্বভাবের সহস্র বিভিন্নতার মধ্যেও কর্ত্তব্যবোধ এক

এবং অদ্বিতীয়। কর্ত্তব্যপালনে আমাদের বিচ্যুতি ঘটিতে পারে, বহুস্থলে ঘটিয়াও থাকে। কিন্তু সমস্ত চ্যুতি বিচ্যুতির মধ্যেও কর্ত্তব্যবোধ চিরজাগরূক। তাই পদস্খলনের মুহূর্ত্তেও আমরা জানি যে পদস্খলন হইতেছে, কর্ত্তব্যপালন না করিলেও কর্ত্তব্য যে কী তাহা সমস্ত সত্তা দিয়া অনুভব করি।

আমাদের পছন্দ অপছন্দ বা কৃত ও অকৃতকর্ম্মের সঙ্গে কর্ত্তব্যবোধের কোন সম্বন্ধ নাই। ভালই লাগুক অথবা মন্দ লাগুক, কর্ত্তব্য কর্ত্তব্যই থাকিয়া যায়। অতীতের কৃত-কর্ম্মের বিষয় ভাবিলেও আমরা কেন যে তাহা করিয়াছি তাহা হয়তো বুঝিতে পারি, কেন প্রলোভন এড়াইতে পারি নাই, তাহাও হয়তো স্পষ্ট হইয়া ধরা দেয়। তবু কর্ত্তব্য যে কী, সে সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকে না। কর্ত্তব্যবোধে তাই মানবাত্মার স্বাধীনতার প্রকাশ। কারণ যাহা করিয়াছি, তাহা ছাড়া অন্য কিছু করাও যে সম্ভব ছিল, ইহাই কর্ত্তব্যবোধের ভিত্তি। যাহা ঘটিয়াছে, তাহাকে অবশ্যম্ভাবী বলিলে কর্ত্তব্যবোধের কোন অর্থ থাকে না। কারণ বিভিন্ন কর্ম্মপদ্ধতির মধ্যে স্বাধীনভাবে একটিকে বাছিয়া লইতে পারিলেই কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্যের কথা উঠে। গাছে ওঠা অথবা না ওঠা আমার ইচ্ছাধীন, তাই গাছে চড়ার বেলা কর্ত্তব্যের কথা বোধগম্য। কিন্তু গাছ হইতে পড়িয়া গেলে কাহাকেও আঘাত করা না করা আমার ইচ্ছাধীন নহে। সে ক্ষেত্রে কর্ত্তব্যের কথা উঠেই না।

কর্ত্তব্যবোধ তাই ব্যক্তিনিরপেক্ষ, অথচ মানবাত্মার স্বাধীনতার উপরে প্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞানের জগতে স্বাধীনতার অবকাশ নাই বটে, কিন্তু বিজ্ঞানের জগত ব্যবহারিক, তাই

ব্রহ্মের সত্তা বিজ্ঞানের সূত্রে প্রকাশিত হইতে পারে না। অন্যপক্ষে কর্ত্তব্যবোধ মানুষের প্রত্যক্ষ অনুভূতি—সে অনুভূতিকেও অস্বীকার করা চলে না। তাই বলিতে হয় যে কর্ত্তব্যবোধে মানুষ ব্যবহারিক জগতের সীমানা অতিক্রমণের আভাস পায়। বিষয়ী হিসাবে মানুষও ব্যবহারিক জগতের অংশ, তাহার মানস ইতিহাসেও কার্য্যকারণসূত্রের একছত্র অধিকার। কিন্তু কর্ত্তব্যবোধে মানুষ কেবলমাত্র বিষয়ী নহে। বিষয়ীর অতীত সত্ত্বার পরিচয় কর্ত্তব্যবোধে প্রকাশিত।

বাস্তবজগতের কার্য্যকারণসূত্র বিষয় এবং বিষয়ী উভয়ের বেলায়ই প্রযোজ্য। কিন্তু কর্ত্তব্যবোধে কার্য্যকারণসূত্রের একাধিপত্য অস্বীকার করিয়া স্বাধীনতার আভাস মেলে। তাই কর্ত্তব্যবোধকে ব্যবহারিক জগতের নিয়ম দিয়া বোঝা যায় না। স্বাধীনতা বা কর্ত্তব্যবোধ তাই বোধাতীত, কাবণ ব্যবহারিক সত্যের ক্ষেত্রেই বুদ্ধির প্রয়োগ। স্বাধীনতা বা কর্ত্তব্যবোধ বোধাতীত, কিন্তু তাই বলিয়া অজ্ঞেয় নহে। বোধাতীত বলিয়া সে জ্ঞানকে বুদ্ধির সূত্রে প্রকাশ করা যায় না,—মানবাত্মার সাধনায় তাহা উদ্ভাসিত।

কর্ত্তব্যবোধকে তাই ব্যবহারিক জগতের শৃঙ্খলার মধ্যে মানবাত্মার ব্রহ্মরূপের আবির্ভাব বলা চলে। কর্ত্তব্যবোধ আছে বলিয়াই মানুষ নিজেকে কেবলমাত্র বস্তু বলিয়া ভাবে না, বিশ্বের বস্তু বৈচিত্র্যের মধ্যে আপনাকে স্বতন্ত্র বলিয়া জানে। অন্য মানুষের কাছেও তাহার সেই দাবী এবং তাই নিজের কর্ম্মের জন্য মানুষ দায়িত্ব স্বীকার করিয়া লয়, অন্যের কাছেও তাহার কার্য্যের কৈফিয়ৎ খোঁজে। এক কথায়

মানুষ আপনাকে আপনার কর্ম্মের অধিকারী বলিয়া দাবী করে, আপনাকে স্বাধীন বলিয়া জানে।

কর্ত্তব্যপালনে মানুষ তাই স্বাধীন, কারণ স্বেচ্ছায় মানুষ কর্ত্তব্যকে বরণ করিয়া লয়। তাই কর্ত্তব্য বিচারে ফলাফলের স্থান নাই, ফলাফল হিসাব করিয়া যে কাজ আমরা করি, তাহাতে ভবিষ্যতের দুঃখসুখের আকর্ষণ আমাদের ইচ্ছাশক্তিকে অভিভূত করে বলিয়া আমাদের স্বাধীনতা ব্যাহত হয়। কর্ত্তব্য স্বাধীন ইচ্ছার প্রকাশ, তাই কেবলমাত্র আত্মার স্বাধীনতা হইতে যে কর্ম্মের উদ্ভব, তাহাই কর্ত্তব্য। কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশও তাই সার্ব্বিক এবং সার্ব্বভৌম,—তাহার ব্যত্যয় নাই, থাকিতে পারে না। যাহা কর্ত্তব্য, তাহা অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ সর্ব্বদাই কর্ত্তব্য, সমস্ত দেশে সমস্ত কালে সকলের জন্যই তাহা এক এবং অদ্বিতীয়।

সাংসারিক বুদ্ধির সঙ্গে কর্ত্তব্যবোধের পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে। সাংসারিক বুদ্ধি দিয়া আমরা সুখ চাই, এবং সুখ পাইতে হইলে যাহা করা দরকার, তাহাকে সমীচীন মনে করি। নীতির সূত্রেও বহুস্থলেই এই সাংসারিক বুদ্ধিই প্রকাশ পায়। ব্যবসায়ে উন্নতি করিতে হইলে সততা না থাকিলে চলে না, কিন্তু তাহার অর্থই এই যে উন্নতির জন্যই সততার প্রয়োজন। তেমনি বলা চলে যে গরম দেশে পরিস্কার থাকিতে হইলে প্রত্যহ স্নান করা দরকার। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও আমাদের কর্ম্মের উদ্দেশ্য কর্ম্মের মধ্যেই নিহিত নয়, বাহিরের অন্য কোন উদ্দেশ্য বা আদর্শের জন্যই বিশেষ কর্ম্মপদ্ধতির আদর। কর্ত্তব্যের বেলায় কিন্তু কাণ্ট ঠিক সেই কথাই অস্বীকার করিয়াছেন। তাহার বক্তব্য যে

কর্ত্তব্যের উদ্দেশ্য কর্ত্তব্য,—বাহিরের অন্য কোন লক্ষ্যের জন্য যে কর্ম্ম সাধিত হয়, তাহাকে আর যাহাই বলি না কেন, কর্ত্তব্য বলা চলে না।

কর্ত্তব্য মানুষের ব্রহ্মরূপের প্রকাশ, অর্থাৎ মানুষের চরম সত্ত্বা কর্ত্তব্যে ব্যবহারিক জগতে আবির্ভূত হয়। ব্রহ্মরূপের প্রকাশ বলিয়া কর্ত্তব্যবোধে ব্যবহারিক জগতের কোন কিছুর সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই। এক কথায় মানুষের ব্যবহারিক সত্ত্বা কর্ত্তব্যবোধকে অনুপ্রাণিত করে না। বিষয়ীর স্বভাব বা মানস ইতিহাস, সংসার ও সমাজের ঘটনাবিপর্য্যয়ের সঙ্গে তাই কর্ত্তব্যের কোন সম্বন্ধ নাই, ব্যবহারিক জগতের সমস্ত বৈচিত্র্য হইতে তাহা মুক্ত। তাই কর্ত্তব্যবোধ স্বয়ম্ভু এবং আপনার মধ্যে পূর্ণ। কর্ত্তব্যবোধের তাই কোন বৈচিত্র্য নাই—কর্ত্তব্য এক, অনাদি এবং সার্ব্বিক।

মানুষের কর্ত্তব্যবোধ তাই কেবলমাত্র স্বাধীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ব্যবহারিক জগতে তাহাকে প্রকাশ করিতে গেলে তাহার ঐক্য ব্যতীত আর কিছুই ধরা পড়ে না। তাই কাণ্ট বলিলেন যে আমাদের কর্ত্তব্য, কর্ত্তব্য পালন করা। কর্ত্তব্য সার্ব্বিক, তাই যে কর্ম্মকে আমরা সার্ব্বিক বলিয়া ভাবিতে পারি, কেবলমাত্র তাহাই আমাদের কর্ত্তব্য। স্বেচ্ছায় সমস্ত মানুষের করণীয় বলিয়া যাহাকে বরণ করিয়া লওয়া যায়, তাহাই আমাদের কর্ত্তব্য।

কর্ত্তব্যে মানবাত্মার স্বাধীনতার পরিচয় মেলে। স্বাধীনতা মানুষের ব্রহ্মরূপের আভাস। তাই সংসারে মানুষের স্বাধীনতা ছাড়া আর কোন কিছুরই মর্য্যাদা নাই। জগৎ প্রপঞ্চে যাহা ঘটিতেছে, তাহার সমস্তই তথ্য, তাহার

সর্ব্বত্রই কার্য্য কারণসূত্রের একাধিপত্য। কাজেই তাহার মধ্যে কোথাও আদর্শ বা মর্য্যাদার অবকাশ নাই। কর্ত্তব্য-বোধে মানবাত্মা আপনার স্বাধীনতা ঘোষণা করে, সৃষ্টি-লীলার অলজ্ঘনীয় শৃঙ্খল অতিক্রম করিবার দাবী করে,—তাই সেখানে আত্মার মহিমা প্রকাশিত হয়।

এই স্বাধীনতাকে বুদ্ধি দিয়া প্রমাণ করা চলে না, তাহা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। স্বাধীনতা বোধাতীত, কিন্তু তাই বলিয়া স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা যায় না। কর্ত্তব্যবোধে আমরা জানি যে আমাদের অন্তরতম সত্ত্বা স্বাধীন এবং সক্রিয়। জগতপ্রপঞ্চের মধ্যে আত্মা আদর্শ নির্দ্দেশ করিয়া সাধনা করিতেছে,—কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের কর্ম্ম জগৎ বহির্ভূতও নহে। কর্ম্মের ধারা ও ফলাফল ব্যবহারিক জগতে প্রকাশিত, তাই ব্যবহারিক জগতের কার্য্য-কারণসূত্রের আধিপত্য আমাদের কর্ম্মে বিরাজমান। কিন্তু তথাপি কর্ত্তব্যবোধে আমরা জানি যে ব্যবহারিক জগতের সমস্ত নিয়মাতীত সত্ত্বাও আমাদের আছে—সেখানে আমরা স্বাধীন।

এ সমাধানে কিন্তু সমস্যার সমাপ্তি হয় না। একপক্ষে জ্ঞানের বিষয়ী হিসাবে ব্যক্তি অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত এবং সেই কারণে যান্ত্রিকতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ। অন্যপক্ষে কর্ম্মের অধিকারী হিসাবে ব্যক্তি সমস্ত অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করিয়া পারমার্থিক সত্যস্বরূপ। কিন্তু কর্ত্তব্যের রঙ্গভূমিও এই পৃথিবী, কাজেই ব্যক্তির পারমার্থিক সত্ত্বা প্রতিমুহূর্ত্তেই ব্যবহারিক জগতে ক্রিয়াশীল। এই কার্য্যকারণ সম্বন্ধ স্বীকার করিলে পারমার্থিক ও ব্যবহারিকের মধ্যে পার্থক্য রক্ষাও অসম্ভব। সমস্যাকে অন্যভাবে দেখিলেও এই একই ফল।

জ্ঞানের বিষয়ীকে ব্যবহারিক ও কর্ম্মের অধিকারীকে পারমার্থিক মনে করার অর্থ এই যে জ্ঞানের জগতের সঙ্গে কর্ম্মের জগতের কোন সম্বন্ধ নাই। তাহার ফলে জ্ঞানহীন কর্ম্ম এবং কর্ম্মহীন জ্ঞান উভয়ই সমান অর্থহীন হইয়া দাঁড়ায়।

অন্যদিক দিয়া বিচার করিলেও কর্ত্তব্যবোধের যে পরিকল্পনা কাণ্ট দিয়াছেন, তাহাতে আমাদের চিত্ত তৃপ্তি পায় না। কর্ত্তব্যবোধ সার্ব্বিক এ কথা স্বীকার করিয়া লওয়া সহজ, কারণ যাহা কর্ত্তব্য, তাহা সকলের পক্ষেই কর্ত্তব্য। কর্ত্তব্যপালনে যখনই আমরা অবহেলা করি, তখনই আমরা জানি যে আমাদের কর্ম্মপদ্ধতিকে সার্ব্বিক করিবার ইচ্ছা আমাদের নাই। এক কথায়, দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে আমরা চাই যে পৃথিবীর অন্য সকলেই কর্ত্তব্য পালন করুক, কেবল আমরা নিজেরা যেন সময় সময় কর্ত্তব্য হইতে অব্যাহতি পাই।

কর্ত্তব্য পালন বা লঙ্ঘনের বেলাই এ কথা উঠে, কিন্তু জীবনে এমন সন্ধিস্থলও বিরল নহে যখন কর্ত্তব্য যে কী, সে সম্বন্ধেই আমাদের মনে সন্দেহের অন্ত নাই। কর্ত্তব্যকে কর্ত্তব্য বলিয়া জানিলে তাহা পালনই করি আর লঙ্ঘনই করি, তাহাকে সার্ব্বিক বলিয়া ভাবা অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু যেখানে কর্ত্তব্য সম্বন্ধেই আমরা অজ্ঞ, সেস্থলে কেবলমাত্র সার্ব্বিকতার বিচারে কর্ত্তব্য নির্ণয় সম্ভব নহে। মিথ্যাকথা বলা অন্যায়, তাই মিথ্যাকথন সার্ব্বিক হইতে পারে না। সকলেই মিথ্যা কহিলে কেহই আর কাহাকেও বিশ্বাস করিবে না, কাজেই মিথ্যা কথাই আর টিকিবে না,—একথাও সত্য। কিন্তু আততায়ীর কবল হইতে নিরপরাধীকে রক্ষা করিবার জন্য মিথ্যা বলা ন্যায় কি অন্যায়—তাহা লইয়া

মতভেদ প্রবল। আসল কথা এই যে কাণ্ট প্রত্যেকটী কর্ম্মকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিয়াছেন, বলিয়াছেন যে কর্ম্মকে সার্ব্বিক ভাবিতে পারিলে তাহা কর্ত্তব্য, না পারিলে তাহা অন্যায়। কিন্তু বস্তুতপক্ষে কোন কর্ম্মই বিচ্ছিন্ন নয়,—বিচ্ছিন্ন ভাবে কর্ম্মের বিচার করিতে বসিলে ন্যায় অন্যায়ের কোন অর্থই থাকে না।

চাবী দিয়া আমি আমার বাক্স খুলি,—চোরও চুরি করিবার জন্য চাবি দিয়া আমার বাক্স খুলিতে পারে। কেবলমাত্র শারীরিক কর্ম্ম হিসাবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? মনোবৃত্তি, উদ্দেশ্য, অতীত ইতিহাস—এক কথায় ব্যবহারিক জগতের জীবন যাত্রার বিভিন্ন উপাদানকে যদি আমরা অবহেলা করি, তবে কর্ম্ম হিসাবে দুইই এক।

ইচ্ছার স্বাধীনতার কথা তুলিয়া কাণ্ট উদ্দেশ্যের তাৎপর্য্যের কথা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কর্ত্তব্যবোধের উদ্দেশ্যে যাহা সাধিত, কেবলমাত্র তাহারই মর্য্যদা আছে, অন্যথায় কোন কাজকে কর্ত্তব্য বলার কোন অর্থ থাকে না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ তিনি বলিয়াছেন যে সওদাগর যখন ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য সততা অবলম্বন করে, তখন তাহার উদ্দেশ্য ধনলাভ—কাজেই তাহার কর্ম্ম বাঞ্ছনীয় হইতে পারে, কিন্তু কর্ত্তব্য নহে। মানুষের আত্মমর্য্যাদার আহ্বানে যে সততা, কেবলমাত্র তাহাকেই কর্ত্তব্য বলা চলে।

উদ্দেশ্যের তাৎপর্য্য স্বীকার করিয়া লইয়াও কর্ম্মফলের তাৎপর্য্য স্বীকার করেন নাই বলিয়াই কাণ্টের বিবরণে তৃপ্ত হওয়া যায় না। কর্ম্মবিচারে কেবলমাত্র উদ্দেশ্য বা কেবল-মাত্র ফলাফল হিসাব করিলে নানারূপ বিড়ম্বনা অশ্যম্ভাবী—

উদ্দেশ্য এবং ফলাফল সমস্ত লইয়াই কর্ম্ম। কাজেই কর্ম্মের সমগ্রতাকে ভুলিলে চলিবে না। বিশ্লেষণের খাতিরে কখনো উদ্দেশ্য, কখনো ফলাফলের বিষয় বিচার চলিতে পারে, কিন্তু কর্ত্তব্যবোধের বেলায় সমগ্রতা লইয়াই আমাদের কারবার।

তাই কেবলমাত্র সার্ব্বিকতার বিচার করিয়া কর্ত্তব্য নির্ণয় চলে না। বিশেষ ঘটনা বা পরিস্থিতির কথা ভুলিয়া গেলে কর্ত্তব্য যে করণীয়, সে সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই, থাকিতেও পারে না। জীবনে কিন্তু বিশেষ পরিস্থিতির মধ্যে বিশেষ কর্ত্তব্য নির্ণয়ই আমাদের সমস্যা। সেখানে সম্বন্ধমুক্ত সাধারণ কর্ত্তব্যবোধ কোন কাজেই আসে না, অথচ বিশেষ পরিস্থিতিতে আমাদের কর্ত্তব্য যে কী, সে বিষয়ের মতভেদের অন্ত নাই। সুন্দর বরণীয়, এ বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু কী যে সুন্দর, তাহা লইয়া সৃষ্টির আদিম দিবস হইতে মানুষের সঙ্গে মানুষের মতান্তর।

মানুষের ব্যবহারিক ও পারমার্থিক সত্ত্বাকে পৃথক করিয়া দেখিবার ফলেই এ সমস্ত সমস্যার উদয়। কর্ত্তব্যবোধে মানুষ কর্ম্মের অধিকারী এবং সেই জন্য পারমার্থিক সত্য-স্বরূপ। অন্যপক্ষে মানুষের ব্যবহারিক সত্ত্বাকেও অস্বীকার করা চলে না,—বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এই ব্যবহারিক মানুষকেই আমরা জানিতে পারি। অথচ পারমার্থিকের সঙ্গে ব্যবহারিকের সম্বন্ধ নির্ণয় আমাদের কল্পনাতীত—সে সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টাই স্ববিরোধী। তাই স্বতন্ত্র, সম্বন্ধহীন ব্যবহারিক ও পারমার্থিকের লীলাভূমি হিসাবে অভিজ্ঞতাও অর্থহীন হইয়া পড়ে, কর্ত্তব্যবোধের যে মর্য্যাদা কান্টিয় দর্শনের প্রতিপাদ্য, তাহাও অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়।

সমস্ত কর্ম্মই বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কার্য্যকারণ সূত্রের অধীন, তাই সে হিসাবে সমস্ত কর্ম্মই ব্যবহারিক। অন্যপক্ষে, সমস্ত কর্ম্মেই মানুষের স্বাধীন আত্মা আত্মপ্রকাশ করে। তাই সমস্ত কর্ম্মই কর্ত্তব্যবোধের প্রকাশ। কিন্তু সমস্ত কর্ম্মেই যদি কর্ত্তব্যবোধ আত্মপ্রকাশ করে, তবে কর্ত্তব্য এবং অকর্ত্তব্যের মধ্যে আর পার্থক্য থাকে না, এবং মানুষের ব্যবহারিক ও পারমার্থিক সত্তার পার্থক্যও নিরর্থক হইয়া পড়ে। বিজ্ঞানাতীত পারমার্থিক জগতে মানুষের আত্মার স্বাধীনতা স্থাপনের প্রয়াস তাই ব্যর্থ হইতে বাধ্য।

সাত

আমাদের অভিজ্ঞতার বিষয় ব্যবহারিক, পারমার্থিক নহে, এই কথা বলিয়া কাণ্ট বিজ্ঞানের বিজয় অভিযানের যৌক্তিকতা প্রমাণ করিতে চাহিলেন। কর্ত্তব্যবোধে মানবাত্মার স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া তিনি ধর্ম্ম এবং আস্তিকতাকে বাঁচাইবার ব্যবস্থাও করিলেন, কিন্তু তাহার ফলে বিশ্বসৃষ্টির পরস্পর-বিরোধী এবং স্বতন্ত্র যে দুইটি কল্পনা আমাদের মনে জাগরূক হয়, তাহাদের মধ্যে বিরোধ মিটাইবার উপায় কি? এই দ্বন্দ্ব নিরসনের চেষ্টা তিনি আর একবার করিয়াছিলেন,— তাহার বর্ণনা দিয়াই আমরা কান্টিয় দর্শনের এ সংক্ষিপ্ত বিবরণ শেষ করিব।

একদিকে সংবেদনার বৈচিত্র্য, অন্যদিকে ধারণার ঐক্য,— তাহাদের মধ্যে যোগ স্থাপন করিয়াই অভিজ্ঞতা। সংবেদনার অনন্ত বৈচিত্র্যকে ধারণায় সুসংবদ্ধ করা যায়, এ কথা অস্বীকার করা চলে না, কারণ অভিজ্ঞতার সম্ভাবনা এই সংযোগের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু অন্যপক্ষে এ সংযোগ যে অত্যাশ্চর্য্য, তাহা অস্বীকার করিবারও উপায় নাই।

আত্মার স্বাধীনতা ও কার্য্যকারণ সূত্রের একাধিপত্য উভয়কেই কাণ্ট স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু এ স্বীকৃতির মধ্যেই এক প্রকাণ্ড সমস্যা নিহিত। তাহাদের মধ্যে মিলন স্থাপন করিতে না পারিলে সমস্ত দর্শন সাধনাই ব্যর্থ হইতে বাধ্য, অথচ মিলন যে কেমন করিয়া সম্ভব, তাহার সঠিক বিবরণ কই?

সার্ব্বিকের সঙ্গে বিশেষের সম্বন্ধ বিচারে কাণ্ট এই সমস্ত সমস্যার প্রতীক খুঁজিয়া পাইয়াছেন।

সার্ব্বিক এবং বিশেষের সম্বন্ধ আদিকাল হইতেই দর্শনের সমস্যা,—কোনদিনই কোন দার্শনিক তাহার কোন সমাধান করিতে পারেন নাই। প্লেটো বিশেষের সত্তা অস্বীকার করিয়া সার্ব্বিকের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন, অ্যারিষ্টটল দেখাইলেন যে বিশেষ-বঞ্চিত সার্ব্বিক অর্থহীন। পক্ষান্তরে, অন্যান্য দার্শনিক বিশেষকেই বাস্তব ধরিয়া সার্ব্বিককে কেবল নামমাত্রে পর্য্যবসিত করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও অভিজ্ঞতার বিবরণ অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। সার্ব্বিক এবং বিশেষ কাহাকেও অস্বীকার করা চলে না, তাহাদের সম্বন্ধের বিবরণও দেওয়া চলে না, রহস্যময় হইলেও তাহাকে বাস্তব না ভাবিয়াও উপায় নাই।

সার্ব্বিক এবং বিশেষের সম্বন্ধ-বিচার কাণ্টেরও উদ্দেশ্য, কিন্তু তিনি প্রত্যক্ষভাবে সে বিচারের চেষ্টা করেন নাই। অভিজ্ঞতায় বাস্তববোধের ভিত্তি বুদ্ধি, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। বুদ্ধির ধারণা সর্ব্বত্রই সার্ব্বিক, অন্য পক্ষে সংবেদনা সর্ব্বক্ষেত্রেই বিশেষ। তাই সংবেদনার সঙ্গে ধারণার সম্বন্ধ লইয়াও সমস্যা উঠে। কথাটি ঘুরাইয়া বলা চলে যে এক দেশকালের অধীন বলিয়া সমস্ত সংবেদনার মধ্যে সম্বন্ধ-স্থাপন সম্ভবপর। বুদ্ধির যে সমস্ত ধারণা সমস্ত অভিজ্ঞতার মূলে, তাহাদের প্রয়োগও বুঝা যায়। কিন্তু পৃথিবীর বৈচিত্র্যের মধ্যেও যে নিয়মানুবর্ত্তিতা,—তাহার ভিত্তি কোথায়? কার্য্যকারণবোধ না থাকিলে বস্তুবোধ থাকিতে পারে না, পূর্ব্বাপর জ্ঞান অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। সমস্ত

সংবেদনা দেশকালজ, তাই সমস্ত সংবেদনাই কার্য্যকারণ-সূত্রেরও অধীন,—এ কথা বোঝা যায়। কিন্তু কোন ঘটনার যে কী কারণ, তাহার কোন বিবরণ কার্য্যকারণ সূত্রের মধ্যে মেলে না।

বিশেষের সঙ্গে সার্ব্বিকের সম্বন্ধে যে সমস্যা নিহিত, তাহা কেবলমাত্র অভিজ্ঞতার বিশিষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে নিবদ্ধ নহে। সার্ব্বিক ব্যতীত বিশেষের কোন সত্ত্বা নাই, বিশেষের সমস্ত গুণলক্ষণ সার্ব্বিকেরই আত্মপ্রকাশের ফল,—একবার একথা স্বীকার করিয়া লইলে নির্গুণ ব্রহ্মের নির্ব্বিকল্প সমাধির মধ্যে সৃষ্টির অনন্ত বৈচিত্র্য বিলুপ্ত হইতে বাধ্য। অন্যপক্ষে বিশেষের স্বতন্ত্র স্বত্বাকে চরম মনে করিলেও সার্ব্বিক ও বিশেষের সম্বন্ধ অজ্ঞেয় মনে হয়। এমন কি বিশেষের যাহা বিশেষত্ব, সেই গুণলক্ষণগুলি কি করিয়া সম্ভবপর তাহাও সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়।

কাণ্ট দেখিলেন যে কার্য্যকারণসূত্রের সঙ্গে বিশেষ ঘটনার সম্বন্ধের মধ্যেও এই একই সমস্যা নিহিত। কার্য্য-কারণবোধ না থাকিলে পূর্ব্বাপর জ্ঞান থাকে না এবং পূর্ব্বাপর জ্ঞান ভিন্ন ঘটনাকে ঘটনা বলিয়া জানাও সম্ভব নহে, সে কথা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। বিশেষ ঘটনার সঙ্গে বিশেষ ঘটনার সম্বন্ধের বিবরণ তাহার মধ্যে কই? বুদ্ধির সার্ব্বিক ধারণার মধ্যে সৃষ্টির বৈচিত্র্যের পরিচয় মেলে না,—বুদ্ধির সার্ব্বিক ধারণা কেবলমাত্র অভিজ্ঞতার সম্ভাবনা নির্দ্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত, কিন্তু সেই সম্ভব অভিজ্ঞতার যে কী রূপ, সে সম্বন্ধে বুদ্ধির ধারণা নির্ব্বাক। বুদ্ধির সার্ব্বিক ধারণাকে অস্বীকার করা চলে না,—অস্বীকার করিলে অভিজ্ঞতার

সম্ভাবনাকেই অস্বীকার করিতে হয়। কার্য্যকারণসূত্রকে তাই অস্বীকার করা চলে না, করিলে পূর্ব্বাপর জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাবোধ এবং বস্তুবোধও অন্তর্হিত হইতে বাধ্য। কিন্তু তাই বলিয়া কার্য্যকারণসূত্র পৃথিবীর স্বভাবকে প্রকাশ করে না, এমন কি বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে কার্য্যকারণ যোগ আবিষ্কার করিতেও তাহা অপারগ।

এ আলোচনার তাৎপর্য্য এই যে বুদ্ধির সার্ব্বিক ধারণা অভিজ্ঞতায় কার্য্যকরী হইলেও কেবলমাত্র তাহাদের দ্বারা অভিজ্ঞতার রূপ উপলব্ধি করা চলে না, অভিজ্ঞতায় তাহাদের প্রয়োগের প্রশ্ন উঠে। এই প্রয়োগের প্রশ্নের উত্তর অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেই মেলে,—বুদ্ধির বিচারে সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অসম্ভব। কাণ্টের কথায় বলিতে হয় যে সার্ব্বিক কার্য্যকারণ সূত্রের প্রয়োগ আমরা অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ ভাবে জানিতে পারি, কিন্তু বিশেষ কার্য্যকারণ সম্বন্ধ জানিতে হইলে অভিজ্ঞতার মধ্যেই তাহা খুঁজিতে হইবে।

বুদ্ধির সার্ব্বিক ধারণা অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষভাবে জানা যায়, কারণ সে ধারণাই অভিজ্ঞতার ভিত্তি। কিন্তু বিশেষ কার্য্যকারণ সম্বন্ধের ব্যাপারে তাহা বলা চলে না, কারণ বহু বিষয়ে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ না জানিয়াও অভিজ্ঞতা সম্ভবপর। আজও পৃথিবীর অনেক কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আমরা জানি না। সার্ব্বিক কার্য্যকারণসূত্রের সঙ্গে বিশেষ বিশেষ কার্য্যকারণবিধির সম্বন্ধের সমস্যা সার্ব্বিকের সঙ্গে বিশেষের সম্বন্ধের সমস্যারই অনুরূপ, তাই এ সমস্যার সমাধান করিতে পারিলে আমাদের জ্ঞানের অনেক তথ্যই পরিষ্কারভাবে ধরা দিবে, এ আশা অসঙ্গত নহে।

আত্মার স্বাধীনতার সঙ্গে কার্য্যকারণ সূত্রের একাধিপত্যের সমন্বয় করিবার সম্ভাবনাও ইহার মধ্যে রহিয়াছে। কারণ বিশেষের বৈশিষ্ট্যকেও স্বাধীনতার প্রকারভেদ মনে করা চলে। বিশেষের সঙ্গে সার্ব্বিকের সম্বন্ধ নিগূঢ়, বিশেষ সার্ব্বিকেরই প্রতিচ্ছায়া। অথচ কেবলমাত্র সার্ব্বিকের স্বভাব বিচার করিয়া বিশেষের বিষয়ে আমরা ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারি না। সার্ব্বিকের স্বভাবের প্রকাশ হইয়াও তাই বিশেষ স্বাধীন, অথচ বিশেষের এই স্বাধীন সত্তাকে তাহার সার্ব্বিকরূপের ব্যতিক্রম মনে করা চলে না। বিশেষ সার্ব্বিকেরই বিশেষ, কিন্তু তবুও কেবলমাত্র সার্ব্বিকের স্বভাব বিচার করিয়া আমরা বিশেষের সত্তার কোন পরিচয় পাই না।

একটি উদাহরণ দিলে হয় তো একথাটি আরো একটু পরিষ্কার হইয়া ধরা দিবে। বিশেষ একটি গোলাপফুলে গোলাপফুলের সার্ব্বিক স্বভাবের কোন ব্যতিক্রম নাই, অথচ কেবলমাত্র তাহার সার্ব্বিক স্বভাবের আলোচনায় আমরা তাহার বিশেষত্বের কোন পরিচয় পাই না। সার্ব্বিকের প্রতিচ্ছায়া হিসাবে সমস্ত গোলাপফুলই এক, অথচ বিশেষ বিশেষ গোলাপের যে স্থানকালজ পার্থক্য, তাহাকে অস্বীকার করিবারও উপায় নাই। দেশকালজ পার্থক্য অবান্তর এবং স্বভাবের ঐক্যই তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ, একথা বলিলেও নিস্তার নাই, কারণ এ ক্ষেত্রে অবান্তর বলিবার অর্থই বা কি?

এ সমস্যার সমাধান করিতে গিয়া কোন কোন দার্শনিক বলিয়াছেন যে বিশেষের স্বভাব ও অস্তিত্বকে পৃথক করিয়া দেখিতে হইবে। বিশেষের স্বভাব তাহার সার্ব্বিকরূপেরই প্রকাশ। কিন্তু তাহার অস্তিত্বের মূলে কার্য্যকারণসূত্র, এবং

দেশকালজ লক্ষণগুলিও তাই কার্য্যকারণ নীতি দিয়াই নিয়ন্ত্রিত। এ বিবরণেও সমস্যার প্রকৃত সমাধান নাই, কারণ ইহার ফলে অস্তিত্বগত লক্ষণের সঙ্গে স্বভাবের সম্বন্ধ যে কী, তাহাই অবোধ্য সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। গোলাপের স্বভাব তাহার সার্ব্বিকরূপের প্রকাশ, অথচ তাহার অস্তিত্ব কার্য্যকারণসূত্রাধীন, একথা বলিলে আমাদের মন তৃপ্তি পায় না। কার্য্যকারণসূত্রেও স্বভাব সক্রিয় না হইলে বিশেষ কারণের সঙ্গে বিশেষ ফলের সম্বন্ধ অর্থহীন হইয়া দাঁড়ায়, এবং সে সম্বন্ধ অস্বীকার করিলে অভিজ্ঞতা উন্মাদের প্রলাপে পর্য্যবসিত হয়। তাই আর একদল দার্শনিক বলিয়াছেন যে যে বিশেষ সার্ব্বিকেরই প্রতিচ্ছায়া, তাই বিশেষের স্বভাবগত বা দেশকালজ সমস্ত লক্ষণেরই ভিত্তি সার্ব্বিকের মধ্যে মেলে। একথা বলিলেও কিন্তু নিস্তার নাই। কারণ তাহা হইলে বিশেষ ও সার্ব্বিকের মধ্যে পার্থক্য অস্পষ্ট ও অর্থহীন হইয়া পড়ে। যদি বিশেষের স্বভাবজ এবং অস্তিত্বগত সমস্ত লক্ষণই আমরা সার্ব্বিকের মধ্যে পাই, তাহা হইলে বিশেষের সঙ্গে বিশেষের যে পার্থক্য, তাহারও ভিত্তি সার্ব্বিকের মধ্যেই থাকিতে বাধ্য। তাহার ফলে সার্ব্বিকের মধ্যেই পূর্ব্বের সমস্যা নতুন করিয়া জাগিয়া ওঠে, সমস্যার প্রকৃত সমাধান হয় না।

এ সমস্যার সমাধান কাণ্ট সৌন্দর্য্যের মধ্যে পাইয়াছেন। সুন্দরের শৃঙ্খলা ও প্রতিসাম্য সহজেই চোখে পড়ে, কিন্তু সুন্দর কেবলমাত্র সুশৃঙ্খলই নয়, স্বাধীনও বটে। তাহার স্বকীয়তাই তাহার প্রাণ। সুন্দর প্রমাণ করে যে শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতা পরস্পরবিরোধী নহে, তাই একপক্ষে সুন্দর বিজ্ঞানের আদর্শ,

অন্যপক্ষে তাহা কর্ত্তব্যের প্রতীক। সুন্দরের মধ্যে বুদ্ধি পরিতৃপ্ত, অর্থাৎ বুদ্ধির যে অভিযান, সুন্দরের মধ্যে তাহা আপনার সিদ্ধি খুঁজিয়া পায়। তাই সুন্দরকে বোধগম্য বলিলে অন্যায় হয় না, কেবল স্মরণ রাখিতে হয় যে, সুন্দর আপনাকে প্রকাশ করে বলিয়া তাহার বোধগম্যতাও স্বকীয়। এই বোধগম্যতাকে উপলব্ধি করাই বুদ্ধির আদর্শ। জ্ঞান, কর্ম্ম ও সুন্দরের ক্ষেত্রে তাই বুদ্ধির সাধনা একনিষ্ঠ। সেই জন্যই কিন্তু তাহাকে আর তখন বুদ্ধি বলা চলে না—তাহাকে বলিতে হয় প্রজ্ঞা।

জ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যবহারিক ও পারমার্থিকের অর্থও তাহাতে পরিষ্কার হইয়া উঠে। জ্ঞানও এক প্রকারের কর্ম্ম এবং বোধগম্যতার সাধনায়ই তাহার আরম্ভ। কিন্তু জ্ঞান কোনকালেই সম্পূর্ণ নয়, কোনকালেই সম্পূর্ণ হইতে পারে না, তাই আমাদের অভিজ্ঞতাও কোনদিনই সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য নহে। বুদ্ধির এ সীমাবদ্ধ জ্ঞান প্রজ্ঞার সম্পূর্ণতার আদর্শকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে না, তাই সে আদর্শের তাড়নায় বুদ্ধি চিরদিনই অশান্ত। প্রজ্ঞার সম্পূর্ণতার আদর্শ পারমার্থিক, কারণ তাহা প্রজ্ঞার স্বভাবেরই প্রকাশ এবং তাহার সঙ্গে তুলনায় বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞান ব্যবহারিক।

পক্ষান্তরে কর্ম্মের ক্ষেত্রেও জ্ঞান নহিলে চলে না, কিন্তু মানুষের জ্ঞান অসম্পূর্ণ। তাই কর্ম্ম সর্ব্বদাই জ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া যায়, কিন্তু সে অভিযানও প্রজ্ঞার আদর্শের প্রয়োজনে। প্রজ্ঞার আদর্শ কিন্তু তাহার স্বকীয় স্বভাবেরই প্রকাশ, তাই কর্ম্ম যখন কর্ত্তব্যবোধপ্রণোদিত, তখন তাহা আপনার মধ্যে আপনি পূর্ণ; বাহিরের কোন উদ্দেশ্য দিয়া

তাই কর্ত্তব্য বিচার চলে না। কর্ত্তব্যবোধ তাই পারমার্থিক সত্যকেই প্রকাশ করিতে চাহে, কিন্তু জ্ঞান অসম্পূর্ণ বলিয়া সাধারণ দৃষ্টিতে মানুষের কর্ম্ম ব্যবহারিকই থাকিয়া যায়।

জ্ঞান ও কর্ম্মের ঐক্যসাধনে কাণ্ট যান্ত্রিকতার সঙ্গে স্বাধীনতার সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়েই প্রজ্ঞার স্বকীয় বোধগম্যতাকে প্রকাশ করিতে চাহে, অসম্পূর্ণ বলিয়া উভয়েই কেবলমাত্র আংশিকভাবে সফলকাম। সুন্দরের বোধগম্যতা প্রজ্ঞার স্বকীয় বোধগম্যতারই পূর্ব্বাভাস, তাই সুন্দরের মধ্যে বোধগম্যতার সন্ধান পাইয়া বুদ্ধি এবং ইচ্ছা উভয়েই উৎসাহিত। জ্ঞান ও কর্ম্মের সাধনার সফলতার আশ্বাস সুন্দরের মধ্যে নিহিত, তাই সুন্দরকে বলা হয় ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ইন্দ্রিয়াতীতের আবির্ভাব।

সুন্দরের মধ্যে তাই কাণ্ট সার্ব্বিকের সঙ্গে বিশেষের সম্বন্ধের সমস্যার সমাধানের আভাস দেখিয়াছেন। সুন্দরের স্বকীয় বোধগম্যতা ব্যক্তির বিশিষ্ট রুচি বা উদ্দেশ্যনির্ভর নয়, তাই সর্ব্বলোক এবং সর্ব্বকালের কাছেই সুন্দরের আবেদন। সুন্দরকে তাই সার্ব্বিক বলা চলে, কিন্তু বিজ্ঞানের সার্ব্বিকের সঙ্গে সুন্দরের পার্থক্যও স্পষ্ট। বিজ্ঞানের সার্ব্বিক, অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার উপায়। তাই অভিজ্ঞতার বিশেষসমূহই বিজ্ঞানের সার্ব্বিকের ভিত্তি। সুন্দরের বেলায় কিন্তু সে প্রয়োজন নাই,—অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তু ব্যবহার করিয়াও সুন্দর স্বাধীন, জ্ঞানগত তাহার কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নাই।

অন্যপক্ষে সুন্দর বিশেষেরই স্বভাবের পরাকাষ্ঠা, সুন্দর কেবলমাত্র আপনাকে প্রকাশ করিয়াই তৃপ্ত। এক কথায়

সুন্দর অসাধারণ, সাধারণ বলিলে সুন্দরকে অসম্মান করা হয়। সাহিত্য অথবা শিল্পে সুন্দরের যে প্রকাশ, তাহার স্বকীয়তা বা মৌলিকতা এই অসাধারণত্ব বা বৈশিষ্ট্যেরই প্রতিচ্ছায়া। তাই সুন্দরের মধ্যে বিশেষ ও সার্ব্বিকের সমাবেশ পরিস্ফুট, কিন্তু সার্ব্বিক ও বিশেষের সমন্বয় কেবলমাত্র সুন্দরের ক্ষেত্রেই নিবদ্ধ নহে, অভিজ্ঞতার প্রত্যেক স্তরেই এ সমন্বয় কার্য্যকরী।

সুন্দর তাই স্বকীয় এবং স্বাধীন, এবং তাহা সত্ত্বেও সার্ব্বিক। কথাটীকে ঘুরাইয়া বলা চলে যে বিজ্ঞানে বিশেষের বৈচিত্র্যকে আমরা একত্রিত করিতে চাই, কিন্তু সে ঐক্য যে কি করিয়া সম্ভব, বিজ্ঞানে তাহার কোন বিবরণ মেলে না। নীতি ও সূত্রের প্রতি বিজ্ঞানের ঝোঁক বলিয়া বিশেষের বৈচিত্র্যের দিকে বিজ্ঞানের লক্ষ্য নাই বলিলেও চলে, অথচ বিশেষের উপরেই বিজ্ঞানের ভিত্তি। সুন্দরের পরিকল্পনায় আমরা দেখি যে কেবলমাত্র বিজ্ঞানের সার্ব্বিক সূত্রই যে ঐক্য প্রকাশ করে তাহা নহে, অভিজ্ঞতার যে বিষয়বস্তুকে আমরা বিশেষের পরাকাষ্ঠা বলিয়া মনে করি, সেই সুন্দরের মধ্যেও বৈচিত্র্য ও ঐক্যের সমন্বয় সুস্পষ্ট। তাহার ফলে সার্ব্বিক ও বিশেষের সম্বন্ধ নূতন ভাবে ধরা দেয়, অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যের মধ্যেও ঐক্য ও সার্ব্বিকতার আশ্বাস পাই।

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে বুদ্ধির সার্ব্বিক ধারণা অভিজ্ঞতার ভিত্তি বলিয়া তাহাদের বিষয়ে সন্দেহ যুক্তিযুক্ত নহে। কিন্তু সে সার্ব্বিকতার মধ্যে অভিজ্ঞতার নিয়মানুবর্ত্তিতা বা ঐক্যের কোন আভাসও মেলে না। অথচ অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যের মধ্যেও ঐক্য রহিয়াছে, এ বিশ্বাস না থাকিলে জ্ঞানের প্রসার সম্ভবপর নহে। আমাদের সাধনার ফলে

সৃষ্টির নূতন নূতন তথ্য ধরা দিবে, বিশেষের সঙ্গে বিশেষের নূতন সম্বন্ধ উদ্ভাসিত হইবে,—এ বিশ্বাস মনে সক্রিয় না হইলে মানুষ কিসের জন্য জ্ঞানবিস্তারের চেষ্টা করিবে ?

সুন্দরের পরিকল্পনায় এই আশ্বাসই মেলে, কারণ বৈচিত্র্য ও ঐক্য, সার্ব্বিক ও বিশেষের সমন্বয়ই সুন্দর বলিয়া প্রতিভাত হয়। কেবলমাত্র তাহা নয়, সুন্দরের মধ্যে যান্ত্রিকতা ও উদ্দেশ্যবোধের মিলনও লক্ষ্যণীয়। সুন্দরের মধ্যে শৃঙ্খলায় যান্ত্রিকতার আভাস রহিয়াছে, অন্যপক্ষে সুন্দরের স্বকীয়তা ও ঐক্য উদ্দেশ্যবোধেরই প্রতীক। সুন্দর স্বকেন্দ্রিক, তাই সুন্দরের বৈচিত্র্য তাহার স্বকীয়তারই প্রকাশ। কিন্তু সেই বৈচিত্র্যের মধ্যেও প্রতিসাম্য রহিয়াছে, তাই সুন্দর সুসংবদ্ধ। সুন্দরের শৃঙ্খলা স্বকীয় এবং স্বকীয়তা সুশৃঙ্খল বলিয়া সুন্দরের মধ্যে যান্ত্রিকতার সঙ্গে উদ্দেশ্যবোধের সমন্বয়।

সুন্দরের মধ্যে স্বকীয়তা ও শৃঙ্খলার, যান্ত্রিকতা ও উদ্দেশ্য-বোধের এ সমন্বয় বিশেষের সঙ্গে সার্ব্বিকের সম্বন্ধেরই একটী সমাধান। অন্য একটী ক্ষেত্রেও কাণ্ট এ সমাধানের আভাস দেখিয়াছেন—সেটী জীব বা শরীরীর ক্ষেত্রে। সুন্দরকে স্বকীয়তার পরাকাষ্ঠা বলা চলে, তাই সুন্দরের ক্ষেত্রে এ সমাধান প্রধানত স্বকীয়তার সঙ্গে শৃঙ্খলার সম্বন্ধের সমাধান। শরীরীকে ঠিক সেই ভাবে উদ্দেশ্যবোধের প্রতীক মনে করা চলে, তাই শরীরীর ক্ষেত্রে যদি সমস্যার সমাধান করা যায়, তবে তাহাকে উদ্দেশ্য বোধের সঙ্গে যান্ত্রিকতার সংঘর্ষের সমাধান মনে করা যায়। ধর্ম্ম ও নীতিবোধ উদ্দেশ্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। সৃষ্টির সমস্ত ব্যাপার যদি কেবল যান্ত্রিকতার অন্ধপ্রকাশ হয়, ঘটনার সঙ্গে ঘটনার সংস্থান যদি

কেবলমাত্র কার্য্যকারণসূত্রাধীন বলিয়া ধরা দেয়,—তবে মানুষের ধর্ম্ম ও নীতিবোধের অবকাশ কই? অন্যপক্ষে, বিজ্ঞানের বিজয় অভিযান সৃষ্টির সমস্ত রহস্যের যান্ত্রিক বিবরণ দিতে চাহে, অভিজ্ঞতার প্রতি ক্ষেত্রে পৌর্ব্বাপর্য্যের অলঙ্ঘনীয় সূত্রের শৃঙ্খল বাঁধিতে প্রয়াস পায়।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে তাই ব্রহ্ম নিয়মাধীন ও যান্ত্রিক। তাহার প্রতি অঙ্গ অন্যান্য অঙ্গের সঙ্গে সংযুক্ত এবং নির্ভরশীল, এবং বিভিন্ন অঙ্গের পরস্পারের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া দিয়াই সৃষ্টিব্যাপারের সম্যক অর্থ গ্রহণ সম্ভবপর। পক্ষান্তরে ধর্ম্ম ও নীতির দৃষ্টিতে ব্রহ্ম উদ্দেশ্যমূলক এবং আদর্শাভিমুখী। সমগ্র বিশ্বসৃষ্টির তাৎপর্য্য না বুঝিয়া বিশেষ অঙ্গের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বোঝাও সম্ভবপর নহে। এক কথায় বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ব্রহ্মাংশ দিয়া ব্রহ্মকে জানিতে হইবে, ধর্ম্ম ও নীতির দৃষ্টিতে ব্রহ্মকে দিয়াই ব্রহ্মাংশকে বুঝিতে হইবে।

বিজ্ঞানের সূত্রের সর্ব্বজয়ী অভিযানের বিরুদ্ধে তাই উদ্দেশ্যবাদীরা জীবজগতের রহস্যকে স্থাপিত করিয়া বলিলেন যে জীবজগতে পৌর্ব্বাপর্য্যের শৃঙ্খল ও যান্ত্রিকতার ব্যত্যয় হইয়াছে। জীবদেহ দিয়া জীবনকে বোঝা যায় না, বরঞ্চ জীবন দিয়াই জীবদেহকে বোধগম্য করা চলে। বস্তুর সঙ্গে বস্তুর সংঙ্ঘর্ষে চেতনার বিকাশের পরিচয় মেলেনা, চেতনার বিকাশ দিয়া বস্তুর সঙ্গে বস্তুর সংঘর্ষ ও সম্বন্ধকে চালিত করা যায়। কেবলমাত্র তাই নয়,—সৃষ্টির সমস্ত প্রকাশের মূলে যদি আমরা সৃষ্টিকারের গোপন এবং গূঢ় কোন উদ্দেশ্যের আভাস না পাই, তবে সৃষ্টির সমস্ত বৈচিত্র্য ও শৃঙ্খলা অর্থহীন হইয়া দাঁড়ায়।

উদ্দেশ্যবাদ ও যান্ত্রিকতার এ সংঘর্ষ দূর করিতে না পারিলে মানুষের কর্ম্ম ও জ্ঞানের বিরোধও চিরন্তন থাকিয়া যায়। সুন্দরের ক্ষেত্রে তাহাদের সমন্বয়ের চেষ্টা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। শরীরীর ক্ষেত্রেও কাণ্ট বলিলেন যে শরীরীকে সুন্দরের মতন করিয়া দেখিতে হইবে। জীবজগতে উদ্দেশ্যবাদ স্বীকার করিয়া লইলেও জীবের বিশেষ উদ্দেশ্য যে অনেক ক্ষেত্রেই অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয়, এই কথা স্মরণ রাখিলেই অনেক সমস্যার কিনারা পাওয়া যায়। জীবদেহ জীবনের অনুকূল, বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়োজনে জীবদেহের পরিবর্ত্তনও হয়—এ সমস্ত কথাই সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া জীবকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্যই জগতের সৃষ্টি, এ কথাও বলা চলেনা। উদ্দেশ্যবাদের সবচেয়ে বড় বিপদ এই যে আমরা ব্যক্তি বা সমাজ বা জাতিগত উদ্দেশ্যকে বিশ্বসৃষ্টির উদ্দেশ্য বলিয়া ভুল করিয়া বসি, এবং সেই ভুলকে সত্য বলিয়া চালাইবার জন্য বাস্তবের অনেক ব্যাপারকে অস্বীকার করিতে চেষ্টা করি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে একশ্রেণীর উদ্দেশ্যবাদীর মতে সমস্ত বিশ্বসৃষ্টির সাধনা মানুষের পরিপূর্ণতা,—তাই প্রাকৃতিক এবং জৈবিক জগতের বিচিত্র সংঘটন তাঁহারা মানুষের পরিণতির সহায়ক বলিয়া দেখিতে চান, কিন্তু তাহাব ফলে তাঁহাদের বিশ্বদৃষ্টি একদেশদর্শী ও পক্ষপাতদুষ্ট হইয়া পড়ে। মানুষের সেবার জন্য পশু, এ কথা যদি কেহ ঘোষণা করেন, তবে সিংহ ব্যাঘ্রের আহারের জন্য মানুষ, তাহাই বা বলা চলিবেনা কেন?

কাণ্ট তাই বলিলেন যে সৃষ্টি ব্যাপারে উদ্দেশ্যবোধকে বাদ দেওয়া চলেনা, কিন্তু সে উদ্দেশ্যবোধ সুন্দরের উদ্দেশ্য-

বোধেরই সামিল। সুন্দরের বিভিন্ন অঙ্গ সুন্দরের পরিকল্পনা-দ্বারা প্রভাবান্বিত, তাই সুন্দরকে উদ্দেশ্যবাদী বলা চলে, কিন্তু সুন্দরের সে উদ্দেশ্যবোধ আপনার মধ্যে পূর্ণ, বাহিরের কোন প্রেরণা তাহার মধ্যে নাই। তেমনি শরীরীর মধ্যেও যে উদ্দেশ্যবাদের আভাস, তাহাকেও শরীরীর সঙ্গে আমাদের যতটুকু পরিচয়, তাহারই মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে হইবে। তাই বিশ্বপ্রপঞ্চের অর্থ করিতে গিয়া বিশ্বপ্রপঞ্চের বাহিরে গেলে চলিবেনা,—বিশ্বব্যাপারের মধ্যেই তাহার উদ্দেশ্য খুঁজিতে হইবে। এক কথায়, আমাদের অভিজ্ঞতার যাহা সামগ্রী, তাহাকে লইয়া উদ্দেশ্যবাদ রচনা করা চলে, অভিজ্ঞতার অতীত কোন উদ্দেশ্যকে টানিয়া আনিলে আমাদের ব্যাখ্যা ভ্রান্ত হইতে বাধ্য।

সেই কথাকেই ঘুরাইয়া কাণ্ট বলিয়াছেন যে বিশ্বসৃষ্টির অর্থ করিতে যান্ত্রিকতা এবং উদ্দেশ্যবাদ উভয় মনোবৃত্তিরই প্রয়োজন। বিজ্ঞানের যান্ত্রিক দৃষ্টি দিয়া সমস্ত বিশ্বব্যাপারকে বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে, অংশের সঙ্গে অংশের যোগে এবং ক্রিয়া প্রক্রিয়ায় বিশ্বকে বুঝিবার সাধনা করিতে হইবে। বুদ্ধির এ অভিযানের কোনদিন শেষ নাই, তাই পৃথিবীর যান্ত্রিক বিবরণও কোনদিন সমাপ্ত হইবেনা, এবং ঠিক সেই কারণেই ব্রহ্মের সমগ্রের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা সম্ভব কিনা, সে প্রশ্নেরও কোনদিন উত্তর মিলিবে না।

ঠিক একই ভাবেই উদ্দেশ্যবাদের দৃষ্টিতেও জগতকে বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে। কোন গোপন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অংশের সঙ্গে অংশের যোগ, তাহা আবিষ্কার করিবার প্রয়াস পাইতে হইবে। সমূহকে না জানিলে সে উদ্দেশ্য

আবিষ্কারের কোন উপায় নাই, তাই সমূহকে জানিবার প্রয়াসে আমাদের জ্ঞান অংশ হইতে অংশান্তরে প্রসারিত হইবে। অনন্তকাল ধরিয়াও বুদ্ধির এ চেষ্টার অবসান নাই, তাই ব্রহ্মের উদ্দেশ্য যে কী, ব্রহ্মের কোন উদ্দেশ্য আছে কিনা, সে প্রশ্নও রহস্যই থাকিয়া যাইবে।

বিশ্বের সঙ্গে সুন্দরের সাদৃশ্য তাই অকারণ নহে,—সুন্দরের মধ্যে বিভিন্ন অঙ্গের যে স্বাধীন সামঞ্জস্য, বিশ্ব-সৃষ্টিতেও আমরা তাহারই প্রতিরূপ দেখি। সুন্দরের অভিজ্ঞতা ব্যক্তির অভিজ্ঞতা, এবং সে অভিজ্ঞতার বিষয়-বস্তুও বিশেষেরই পরাকাষ্ঠা, অথচ তাহা স্বত্বেও সুন্দর সার্ব্বিক। মানুষের জ্ঞানও ব্যক্তিরই অভিজ্ঞতা, এবং সে অভিজ্ঞতাও প্রত্যক্ষভাবে বিশেষেরই অভিজ্ঞতা, অথচ তাহারি ফল আমরা বিশ্বজগতের সার্ব্বিকরূপ জানিতে চাহি।

কাণ্টের দর্শন সাধনার পরিসমাপ্তি এইখানে। যান্ত্রিকতা দিয়া বিশ্বসৃষ্টির রহস্য আবিষ্কারের চেষ্টা মানুষের বুদ্ধির ধর্ম্ম, কিন্তু সে সাধনা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বে ব্রহ্মকে যান্ত্রিক বলিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। উদ্দেশ্যবাদের আদর্শে সৃষ্টির তাৎপর্য্য ও মহিমা উপলব্ধিও মানুষের নীতিবোধের সাধনা, কিন্তু তাই বলিয়া ব্রহ্মকে উদ্দেশ্যমূলক বলিবারও আমাদের কোন অধিকার নাই। যান্ত্রিকতা ও উদ্দেশ্যবাদ উভয়কেই তাই কাণ্ট ব্যবহারিক বলিয়াছেন, তাহাদের লক্ষ্য অভিজ্ঞতার সঙ্গে অভিজ্ঞতার সামঞ্জস্য সাধন, কিন্তু ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ উভয়েরই ক্ষমতা বা লক্ষ্যের বহির্ভূত।

আট

বিজ্ঞান বিশেষের ভিত্তির উপর সার্ব্বিক সূত্রের প্রতিষ্ঠা করে, তাই বিশেষের সঙ্গে সার্ব্বিকের সম্বন্ধ বিচার করিতে না পারিলে বিজ্ঞানের কর্ম্মপদ্ধতির স্ববিরোধ মেটেনা। সুন্দর এবং শরীরীর সঙ্গতির মধ্যে বৈশিষ্ট্য, ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র্যের পরিচয়ে আমরা সেই সম্বন্ধ-সমন্বয়েরই আভাস পাই। বৈজ্ঞানিক কর্ম্মপদ্ধতিকে ব্যবহারিক ভাবিবার ফলে এক পক্ষে বিজ্ঞানের প্রসার ও প্রগতির পথে সমস্ত বাধা দূর হইয়া যায়, অন্যপক্ষে বিজ্ঞানের গোঁড়ামি ও অন্ধবিশ্বাসও শ্লথ হইয়া পড়ে।

এ সম্বন্ধে একটু ভাবিলে কাণ্টের দৃষ্টিভঙ্গির সার্থকতায় অবাক হইয়া যাইতে হয়। আজ একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে বর্ত্তমান জগতে বিজ্ঞান সন্দেহবাদে পরিপূর্ণ। অথচ গত শতকের ইতিহাস বিজ্ঞানের বিজয়-যাত্রার ইতিহাস। নব নব আবিষ্কারে বিজ্ঞান সৃষ্টির নূতন নূতন রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া তৃপ্ত হয় নাই, দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছে যে বিজ্ঞানের কর্ম্মপদ্ধতি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই প্রযোজ্য, এবং সেই কর্ম্মধারায় সৃষ্টির চিরন্তন রহস্য একদিন না একদিন প্রকট হইবেই।

কাণ্ট বিজ্ঞানের সে বিজয়যাত্রাকে বরণ করিয়া নিয়াছেন, তাহার অভিযানকে সফল করিবার সাধনা করিয়াছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে বিজ্ঞানের সর্ব্বব্যাপী দাবী অস্বীকার করিতেও তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নাই। ব্যবহারিক জগতে

বিজ্ঞানের দাবীকে স্বীকার করিয়া লইয়া তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে বিজ্ঞানের পারমার্থিক প্রয়োগ অর্থহীন। সুন্দরকে আমরা যতক্ষণ সুন্দর বলিয়া গ্রহণ করি, ততক্ষণ সুন্দরের মর্য্যাদা প্রশ্নাতীত। কিন্তু সুন্দর যদি বাস্তবের দাবী করিয়া বসে, তবে পদে পদে ভ্রান্তি ও বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। ঠিক সেই ভাবে বিজ্ঞানও যতক্ষণ আপনার উপযুক্ত ক্ষেত্রে আপনার দাবী জানায়, ততক্ষণ বিজ্ঞান অজেয়, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে ব্যবহারিক জীবনের সীমানা অতিক্রম করিয়া বিজ্ঞান পারমার্থিক সত্য প্রকাশ করিতে চাহে, সেই মুহূর্ত্তে বিজ্ঞানের মধ্যেই দ্বন্দ্ব ও স্ববিরোধ বিজ্ঞানের সম্ভাবনাকেই বিনষ্ট করিতে চাহে।

কাণ্টের বিশেষ কৃতিত্ব এই যে, একপক্ষে যেমন তিনি বিজ্ঞানের প্রয়োগ ও প্রসারের সীমানা নির্দ্দেশ করিতে চাহিয়াছেন, অন্যপক্ষে তেমনি সেই ক্ষেত্রের মধ্যে বিজ্ঞানের সার্ব্বিকতা ও নিশ্চয়তার প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বিজ্ঞানের নিত্য নব আবিষ্কারে মুগ্ধ অন্ধ ভক্তদের সঙ্গে তিনি বিজ্ঞানকে অভিজ্ঞতার সর্ব্বসমস্যার সমাধান বলিয়া মনে করেন নাই, আবার অন্যপক্ষে বিজ্ঞান বিরোধীদের সঙ্গে বিজ্ঞানকে অস্বীকার করিবারও কোন চেষ্টা করেন নাই।

বিজ্ঞানের কর্ম্মপদ্ধতির পরিপূর্ণতর উপলব্ধিতে বিজ্ঞানের সঙ্গে আদর্শবোধের সংঘর্ষ মিটাইবারও নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। বিজ্ঞানকে যদি সৌন্দর্য্যবোধের দৃষ্টি দিয়া দেখা হয়, তবে যান্ত্রিকতার সঙ্গে আদর্শবাদের সমন্বয় সম্ভব হইয়া আসে, এবং কাণ্টের দর্শনের যে তাহাই লক্ষ্য, সেকথা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। সেই সঙ্গে একথাও চোখে পড়ে যে বর্ত্তমানের

বিজ্ঞানে আর পূর্ব্বের মত আপনার কর্ম্মপদ্ধতিতে অন্ধবিশ্বাস নাই, কান্টিয় মনোবৃত্তির বিকাশ বর্ত্তমানের বিজ্ঞানে সুস্পষ্ট। তাই আজ বৈজ্ঞানিক পরিষ্কার স্বীকার করেন যে বিজ্ঞানের কর্ম্মপদ্ধতির ব্যবহারিক কার্য্যকারিতা যতই গভীর হোক না কেন, তাহার পারমার্থিক তাৎপর্য্য সম্বন্ধে কোন কথা বলা অসঙ্গত।

দার্শনিক ব্যবহারবাদের সূত্রপাত ও ভিত্তি তাই কান্টের দর্শনের মধ্যেই মেলে। কান্টের সঙ্গে আধুনিক ব্যবহার-বাদীর পার্থক্য এই যে, বিজ্ঞানের কর্ম্মপদ্ধতির পারমার্থিক তাৎপর্য্য নাই বলিয়া ব্যবহারবাদী তাহার সার্ব্বিকতাকে অস্বীকার করিতে চাহে। কিন্তু কান্ট অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সার্ব্বিকতাকে সন্দেহ করিবার কোন অবকাশ রাখেন নাই। অন্যপক্ষে ব্রহ্মবাদের সঙ্গে কান্টিয় দর্শনের পার্থক্যও সমানই সুস্পষ্ট। ব্রহ্মবাদ বিজ্ঞানের সাধনাকে পরাবিদ্যায় রূপান্তরিত করিতে চাহে, অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের যে সার্ব্বিকতা, তাহারই অনুরূপ সার্ব্বিকতা পরাবিদ্যার ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে, কিন্তু কান্টিয় দর্শনের মর্ম্মই এই যে, মানুষের জ্ঞান ব্যবহারিক জগতের মধ্যেই সক্রিয়, ব্যবহারিক জগত অতিক্রমনের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের অবসানও অবশ্যম্ভাবী।

বিজ্ঞান, কর্ত্তব্যবোধ ও সৌন্দর্য্যানুভূতি, অভিজ্ঞতার এ তিন অঙ্গকেই কান্ট স্বীকার করিতে চাহিয়াছেন। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ নিগূঢ় একথা সত্য, কিন্তু সম্বন্ধ যতই গভীর হোক না কেন, তাহারা যে মানব মনের স্বতন্ত্র বিকাশ, সেকথাও সমান সত্য। মূলতঃ তাহারা হয়ত একই বিষয়ীর

বিচিত্র লীলা, কিন্তু তাহা হইলেও লীলা যে বিচিত্র, সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাই কান্টিয় দর্শনে অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য ও বহুমুখী রূপের আভাস মেলে, তাহাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টার পরিচয় পাই।

অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য যাহাদের চিত্তকে আলোড়িত করে, বিজ্ঞান, কর্ত্তব্যবোধ এবং সৌন্দর্য্যানুভূতি যাহাদের হৃদয়ে প্রবল,—কান্টিয় দর্শন চিরদিনই তাহাদিগকে আকর্ষণ করিবে। জ্ঞানের সঙ্গে কর্ত্তব্যের সংঘর্ষ অথবা যান্ত্রিকতার বিবর্ত্তনে সৌন্দর্য্যবোধের হানি দেখিয়া যাহারা জীবনে বীতশ্রদ্ধ, অথবা জীবনের বৈচিত্র্যকে যাহারা অস্বীকার করিতে চাহেন,—তাহারা কান্টিয় দর্শনের নীরস কাঠিন্যে অভিভূত হইতে পারেন। কিন্তু মানুষের কর্ত্তব্যবোধে যাঁহাদের শ্রদ্ধা অটুট, মানুষের জ্ঞানসাধনা যাঁহাদের বরণীয়, মানুষের সৌন্দর্য্যবোধে যাঁহারা কর্ম্ম ও জ্ঞানের সমন্বয়ের আভাস দেখিতে পান, তাঁহাদের অন্তরে কাণ্টের দর্শন চিরদিনই অনুপ্রেরণা যোগাইবে। কাণ্টের সঙ্গে তাঁহারাও বলিবেন যে দর্শন বলিয়া কিছুই নাই,রহিয়াছে দার্শনিক মনোবৃত্তি এবং সেই মনোবৃত্তি অভিজ্ঞতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের আত্মার চরম সাধনা ও তাৎপর্য্য জানিতে চাহে। দার্শনিক সেখানে কেবলমাত্র বিজ্ঞানবিদ নহেন, তিনি কর্ত্তব্যনির্দ্দেশক এবং সুন্দরের সাধক।

শব্দ-সংকেত

ঐতিহাসিকতা—historicity
বিষয়—object
বিষয়ী—subject
প্রতিমাণ—criterion
অভিমত, মত—opinion
বিশেষ—particular
সার্বিক—universal
সার্বিকতা—universality
সাধারণ—general
আপেক্ষিক—relative
সংযোজন, সংশ্লেষণ—synthesis
বিশ্লেষণ—analysis
বিশ্বদৃষ্টি—weltanschaung
যান্ত্রিক—mechanistic, mechanical
পৌর্ব্বাপর্য্য—sequence
যান্ত্রিকতা—mechanism
তুলাদণ্ড—standard
প্রকৃতির পর্য্যায়—order of nature
কার্য্যকারণ বিধি—principle (law) of causality
ব্যবহারিক—empirical
স্বভাব—nature
সংযোজক—synthetic
প্রত্যয়—concept
সংযোজক সার্ব্বভৌম বাক্য—synthetic a priori judgment
রূপ—Form, idea
পারমার্থিক—transcendent
ব্রহ্ম—noumenon, absolute
সংবেদনা—sensation
অনুষঙ্গ—association
বুদ্ধিবাদী, বৌদ্ধিক—rationalist
দত্ত—datum
অভিজ্ঞতাবাদী—empericist
অনিবার্য্যতা—necessity
শাব্দিক—verbal, tautologous
বোধগম্যতা—intelligibility
পরাবিদ্যা—metaphysics
সম্ভাব্যতা—possibility
মননরীতি—category
প্রকৃতি—phenomenon, appearance
সঙ্গতি—coherence, consistency
জ্ঞানতত্ত্ব—epistemology

মুহূর্ত্তিক—momentary
পূর্ব্বমীমাংসা—presupposition
দ্রব্যগুণ, পদার্থত্ব—Substantiality
ঘটনা—event
এককালীন—simultaneous
পর্য্যায়—order
সংবেদনার পর্য্যায়—order of perception
পর্য্যায়ের সংবেদনা—perception of order
ক্রমশীল—continuous
উদ্দেশ্যবোধ—finality, teleology
প্রতিসাম্য—symmetry
শরীরী—organism
ব্যবহারবাদ—pragmatism
ব্রহ্মবাদ—absolutism
বুদ্ধি—understanding
প্রজ্ঞা—reason

হুমায়ুন কবিরের অন্যান্য বই

কবিতা :

স্বপ্ন সাধ

সাথী

অষ্টাদশী

মসদ্দশে হালী

Poems

আলোচনা :

Kants on Philosophy in General

ধারাবাহিক (যন্ত্রস্থ)